ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™ SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৪ সংখ্যা ।। ২৯ ভাদ্র, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com

‘অতিরিক্ত জমি’ গোপন রাখা হয়েছিল কোন স্বার্থে?

গূঢ়পুরুষ ।। সিঙ্গুরের রাজনৈতিক শক্তি পরীক্ষায় জয় কার? মমতার দাবি জয় কৃষির। বুদ্ধবাবুদের দাবি জয় শিল্পের। ভাল কথা। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ও শিল্প দুইই জয়ী। তবে পরাজয়টা কার? পরাজয় হয়েছে রাজ্যের সাধারণ মানুষের। পরাজিত হয়েছে করেই এখন বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসন চলছে। ‘জনগণের স্বার্থে জনগণের বামফ্রন্ট সরকার’ এটাই বড় মিথ্যাচার। এই রাজ্যে বামদলের অনুগত শিল্পপতি, প্রমোটার, স্তাবক, ক্যাডারদের স্বার্থরক্ষাই বামফ্রন্ট তথা সি পি এম পরিচালিত রাজ্য সরকারের এখন

> “ টানা দু’বছর বুদ্ধ-নিরুপমরা রাজ্যবাসীকে মিথ্যা কথা বলেছেন। এই মিথ্যাচারের পিছনে নিশ্চিতভাবেই কোনও মতলব ছিল। তাই রাজ্যবাসীর জানার অধিকার আছে প্রকল্পের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কৃষিজমি অধিগ্রহণ করার কারণটি কি? ”

শুভ বুদ্ধির শুভ চিন্তার। সিঙ্গুরের সাধারণ মানুষ বিগত দু’বছরের রাজনৈতিক লড়াইতে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তার কতটা ক্ষতিপূরণ পাবেন তাঁরা জানেন না। সিঙ্গুরে টাটারা ফিরবে কি না অথবা ফিরলেও সেই প্রত্যাবর্তনে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নে জোয়ার আসবে কি না সে সবই অজানা। তবে যে কথাটা জানা গেল তা হলো রাজ্যের প্রশাসন পরিচালনার যোগ্যতা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মশাইয়ের নেই। নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর প্রমাণ করে দিয়েছে যে মিথ্যাচার ও পেশি শক্তির উপর নির্ভর প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সিঙ্গুরের ঘটনাবলীই প্রমাণ করেছে ‘শিল্পায়ন’ ‘উন্নয়ন’ এইসব গালভরা বড় বড় কথা বলে পার্টির প্রমোটারদের পাইয়ে দিতেই বুদ্ধ-নিরুপমরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি তিন ফসলি জমি সেখানে হুকুম দখল করেছিলেন। তা না হলে প্রায় ২০০ একর অতিরিক্ত জমি টাটাদের প্রকল্প এলাকায় এবং তার আশেপাশে পাওয়া গেল কীভাবে। যে জমি এখন বুদ্ধবাবুরা অনিচ্ছুক চাষিদের ফেরৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এই

(এরপর ২ পাতায়)

সিঙ্গুরের পর গোর্খাল্যাণ্ড সিপিএমের আরও বড় বিপদ ডেকে আনছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সিঙ্গুরেই শেষ নয়, সিপিএম সরকারের সামনে আরও বড় বিপদ আসছে। সেটা পৃথক গোর্খাল্যান্ড ইস্যুকে কেন্দ্র করে। ৮ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে এই ইস্যুতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব দিল্লীতে হাজির হয়েছেন। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার ১৯ জন নেতা দিল্লী গিয়েছিলেন। ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিনিধিরাও। রাজ্য সরকারের শীর্ষকর্তাদের আশঙ্কা, সিঙ্গুরের জট না হয় দু’বছরেই কেটেছে। কিন্তু গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে সরিয়ে এনে মোর্চা নেতাদের পার্বত্য পরিষদের প্রশাসনে বসানো এতটা সহজ হবে না। মোর্চা যেভাবে ক্রমেই আক্রমণাত্মক হয়ে চলেছে তাতে পাহাড়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন রাজ্য প্রশাসনের কর্তারা। গোর্খালিদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে বহিঃশত্রুও যে এর পিছনে নেই তা নিয়ে নিশ্চিত নয় প্রশাসন। কারণ, নেপালের অভিজ্ঞতা এদেশের গোয়েন্দাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। তাদের ধারণা, কমিউনিস্ট চীনের আর্থিক এবং সামরিক মদতেই ‘হিন্দুরাষ্ট্র’ নেপালে মাওবাদীদের রাজ প্রতিষ্ঠ

বিমল গুরুং

হয়েছে। তাহলে কি চীনের পরবর্তী লক্ষ্য দার্জিলিং। কারণ এক্ষেত্রে পাহাড়ে পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন এমন সময় শুরু হল যখন নেপালে মাওবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সেখানে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র কোথায় কাজে লাগানো হবে এই ভয়ও পাচ্ছে অনেকে। গোর্খা নেতা বিমল গুরুং বলে দিয়েছেন, ২০১০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে তাঁদের পৃথক রাজ্যের দাবি মানা না হলে মোর্চা নেতারা আন্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যাবেন। অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধ শুরু হবে। আগামী দু’বছরে রাজ্য কিংবা কেন্দ্র কোনও সরকারই যে গোর্খাল্যান্ডের দাবি মেনে নেবে তা বাস্তবসম্মত নয়। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বুকে আবার এক রক্তঝরা দিন আসতে চলেছে। এখনই রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমস্তরকম অসহযোগ শুরু করেছে মোর্চা নেতারা। ইলেকট্রিক বিল দেওয়া বন্ধ, পাহাড়ের নামী-দামি রেঁস্তরা দখল করে অফিস খুলেছে তারা। গাড়িতে লেখা হচ্ছে ‘জি এল’। নিজস্ব পুলিশ বাহিনীতে ৪০০ যুবক-যুবতী যোগ দিয়েছেন। বাকি শুধু অস্ত্র নিয়ে আন্দোলনে নামা। রাজ্য প্রশাসনের কপালে সেই কারণেই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। সিঙ্গুর নয়, সিঁদুরের মেঘ এখন কাঞ্চনজঙ্ঘায়।

স্বামী লক্ষ্মণানন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় দাবি

নবীন সরকার ধর্মান্তরকরণের হিসাব দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। স্বামী লক্ষ্মণানন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় হিন্দু সাধু-সন্তরা এবার ওড়িশায় ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করার সংকল্প নিলেন। বিধর্মী কুচক্র বিদারণ মহারথী, বেদান্ত কেশরী স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী মহারাজ -এর স্মৃতিতর্পণ অনুষ্ঠানে চার শতাধিক সাধুসন্ত উপস্থিত ছিলেন। ভুবনেশ্বরের স্বাধীনতা সংগ্রামী ভবন চত্বরে। যে সরকার এরকম উচ্চকোটির প্রবীণ হিন্দু সন্ন্যাসীর জীবনই রক্ষা করতে পারেনি, সেই সরকার এবার সাধু-সন্তদের উপর তার ক্ষমতা জাহির করতে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভাস্থলসহ গোটা ভুবনেশ্বরেই ১৪৪ ধারা জারি করে। শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার আয়োজকও ছিলেন সভাস্থলে নিয়ে আসছিল তাদেরকেও ধরে লক-আপে আটকে রাখে সরকারি প্রশাসন। যে প্রশাসন স্বামী লক্ষ্মণানন্দের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারই করতে পারেনি, তাদের যত বীরত্ব যেন সাধুদের উপরে পীড়ন করাতেই। এ যেন সেই মোগল আমল, ইংরেজ আমল অথবা ৭৫-এর জরুরি অবস্থা

স্বামী লক্ষ্মণানন্দের স্মরণসভায় সাধু-সন্তরা।

স্বামীজীকে এই অভিধায় অভিহিত করেন গোবর্ধনপীঠের শংকরাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। বার বার স্বামীজীকে নিহত করার চেষ্টা হয়েছে, সর্বশেষে বিধর্মী আততায়ীর দল সফল হয়েছে গত ২৩ আগস্ট রাত্রে।

প্রয়াত স্বামী লক্ষ্মণানন্দজীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা হওয়ার কথা ছিল ৬ সেপ্টেম্বর সাধুরাই। শেষ পর্যন্ত সাধু-সন্তদের চাপে নবীন পট্টনায়ক সরকার সভাস্থলের উপর থেকে ১৪৪ ধারা তুলে নিলেও রাস্তায় রাস্তায় সাধু সন্তদের আটকায়। কয়েকজন সাধুকে তো ভুবনেশ্বর রেল স্টেশনেই গ্রেপ্তার করা হয়। এমনকী যেসব স্বেচ্ছাসেবকরা তাদেরকে রাস্তা দেখিয়ে জারির পরের অবস্থা। ব্যক্তির মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ করার মৌলিক অধিকারকে খর্ব করার মতো অগণতান্ত্রিক নিন্দনীয় তৎপরতা যার পরিচয় দিল নবীন পট্টনায়কের নেতৃত্বাধীন বিজেডি-বিজেপি জোট সরকার। অনেক সাধু-সন্তরা

(এরপর ২ পাতায়)

পঞ্চাশটি নামের আড়ালে সন্ত্রাস চালাচ্ছে সিমি

সফদর নাগৌরি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পূর্ব ও উত্তর ভারতের পর এবার ইসলামিক জেহাদী গোষ্ঠীগুলির লক্ষ্য দক্ষিণ ভারত। ভারতীয় গোয়েন্দাদের তথ্য অনুযায়ী কুখ্যাত ইসলামিক ছাত্র সংস্থা সিমি এদেশে নিষিদ্ধ হওয়ার পর ভারত জুড়ে কমপক্ষে পঞ্চাশটি নামে তাদের কাজকর্ম চালাচ্ছে। বিশেষত দক্ষিণ ভারতে। সেখানে চব্বিশটি নামে তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সেই চব্বিশটি সংস্থাই পরোক্ষভাবে তালিবান, আল কায়েদা এবং পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে কাজ করছে।

তথ্য সূত্র অনুযায়ী, দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে কর্মরত এইসব সংস্থাতে সিমি মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের নিয়ে আসছে। এদের কোনওটা সেবামূলক, কোনওটা শিক্ষামূলক এবং কোনওটা বা অর্থসংগ্রহকারী সংস্থা। এরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করলেও এদের লক্ষ্য একই এবং তা সম্পূর্ণ নেপথ্যে থেকে নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চালন করছে আল-কায়েদা ও আই এস আই-এর অভিজ্ঞ কমান্ডাররা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য অনুসারে কেন্দ্রের গোয়েন্দা বাহিনী এবং রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তরগুলি এদের কাজকর্মের উপর নজর রাখছেন। তবে আইনগত দিক থেকে কিছু করতে পারছেন না। এছাড়া এই সংস্থাগুলির কৌশলগত কারণেও বহু ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তার যথাযথ প্রয়োগও ঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না।

বিশেষজ্ঞদের মতে ইসলামিক গোষ্ঠীগুলি ভারতের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সুযোগ নিয়ে ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে নিয়েছে। রাজধানী দিল্লী সহ উত্তর ভারতের বহু জায়গায় ঘাঁটি তৈরির কাজ শেষের দিকে। এবার দক্ষিণ ভারত ওদের লক্ষ্য। এর জন্য মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের

(এরপর ২ পাতায়)

কলকাতায় সঙ্ঘের গুরু পূজন উৎসব

আত্মপরিচয়ের স্পষ্ট ধারণার অভাবেই নানা সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ন্যাশানাল আইডেনটিটি বা জাতীয় আত্মপরিচয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার জন্যই আমাদের দেশে নানা সংকট দেখা দিচ্ছে। সম্প্রতি প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী 'ক্ল্যাস অফ সিভিলাইজেশন-এর লেখক স্যামুয়েল হান্টিংটন ৯/১১-র ঘটনার পর 'হু আর উই?' (Who are We?) গ্রন্থে আমেরিকাবাসীকে নিজেদের আত্মপরিচয় সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন। কেননা ৯/১১-তে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের নায়ক যে দুজন ছিলেন, তারা দুজনেই আমেরিকান নাগরিক। তাই নাগরিক হলেই রাষ্ট্রীয় হওয়া যায় না। জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে একই বোধ হলো রাষ্ট্রীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব। তাই হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব। তাই দেখি — স্বামী বিবেকানন্দও চিকাগো ধর্মমহাসভায় (১৮৯৩) প্রাচীন সন্ন্যাসী পরম্পরা, সকল সম্প্রদায়ের জননী ভারত এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দু— এই তিনজনের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। গত ৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা শাখার উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের আয়োজিত গুরুপূজন উৎসবে একথা বলেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ ডঃ মনমোহন বৈদ্য। এদিন দুই স্থানেই শতাধিক স্বয়ংসেবক গুরু গৈরিক ধবজকে পূজা করে নিজ নিজ দক্ষিণা সমর্পণ করেন। শ্রীবৈদ্য আরও বলেন, গুরু-শিষ্য ধারনা ও গুরুদক্ষিণা-র ভাবনা-সবটাই ভারতীয়

(এরপর ৩ পাতায়)

অতিরিক্ত জমি গোপন রাখা হয়েছিল কার স্বার্থে?

(১ পাতার পর)

লুকানো জমি রাজ্য সরকার কোন স্বার্থে অধিগ্রহণ করেছিল? সহজ সরল উত্তর, পার্টির প্রমোটারদের ব্যবসায়িক স্বার্থে। প্রকল্প এলাকায় জমির দাম হু হু করে বাড়বে। সোনার দামে বিকোবে। অল্প টাকা দিয়ে হুকুম দখল করা জমিতে পার্টির প্রমোটিং ব্যবসা রমরম করে চলবে। বুদ্ধ-বিমান-নিরুপমের দলবলেরা তখন রাজ্যবাসীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে, 'দ্যাখ সিঙ্গুরে কেমন শিল্পায়ন হয়েছে। আজ থেকে দু'বছরের কিছু বেশি সময় ধরে সিঙ্গুরে মমতা বনাম বুদ্ধের ক্ষমতার দড়ি টানাটানি চলেছে। মমতার দাবি অনিচ্ছুক চাষিদের জমি হুকুম দখল করা যাবে না। তাঁদের জমি ফেরৎ দিতে হবে। বুদ্ধ-নিরুপমের বক্তব্য, অধিগ্রহণ করা জমি ফেরৎ দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত বাধা আছে। দেওয়া যায় না। তা ছাড়া টাটাদের প্রকল্পের প্রয়োজনে যতটা জমির প্রয়োজন ছিল রাজ্য সরকার ঠিক ততটুকু জমিই অধিগ্রহণ করেছে। কোনও বাড়তি জমি নেই যা চাষিদের ফেরৎ দেওয়া যায় অথবা পুনর্বাসনের জন্য জমিহারা পরিবারদের দেওয়া যায়। বিগত ২০০৬-এর মার্চ মাসে টাটাদের সঙ্গে চুক্তির পর জমি অগ্রিহণ করা হয়। অর্থাৎ টানা দু'বছর বুদ্ধ-নিরুপমরা রাজ্যবাসীকে মিথ্যা কথা বলেছেন। এই মিথ্যাচারের পিছনে নিশ্চিতভাবেই কোনও মতলব ছিল। তাই রাজ্যবাসীর জানার অধিকার আছে প্রকল্পের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কৃষিজমি অধিগ্রহণ করার কারণটি কি? কোন স্বার্থরক্ষায় এই অতিরিক্ত জমি গোপন রাখা হয়েছিল? রবিবার রাত্রে (৭ সেপ্টেম্বর) রাজভবনে দু'দফা বৈঠকের পর বুদ্ধ বাবুরা তাঁদের ঝুলি থেকে 'অতিরিক্ত জমি' নামক বিড়ালটি বার করে দেখান। এই কাজটি দু'বছর আগে করলে সিঙ্গুরে সিঁদুরে মেঘ ঘনীভূত হতো না। এত মানুষের প্রাণ যেত না। তাপসী মালিক আজও বেঁচে থাকত। পশ্চিমবঙ্গের কপালে 'শিল্প বিরোধী' তকমা লাগানো হতো না। এর দায় একমাত্র বুদ্ধ বাবুদের এবং তাঁদের মার্কসবাদী পার্টির নেতাদের। ভেবেছিলেন আমরা ২৩৫ আর ওরা ৩০। স্রেফ এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে রাতকে দিন এবং দিন কে রাত বলে চালিয়ে দেবেন। কিন্তু মিথ্যাচার আর লাঠি গুলি চালিয়ে প্রশাসন চালানো যায় না। শিল্পায়নের খুড়োর কল সামনে রেখে পার্টির নেতা স্তাবকদের উন্নয়ণ করা যে আর যাবে না এই কথাটা বুঝতে বুদ্ধ বাবুদের দু'বছর সময় লাগলো। তবে দেরি হলেও সিঙ্গুরের সিঁদুরে মেঘ সরে আশার আলো দেখা দিয়েছে তাতেই রাজ্যবাসী খুশি। বুদ্ধ বাবুরা না মমতারা কে জিতেছে তা অবান্তর। শহরে এবং গ্রামের নবীন প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কৃষি ও শিল্পের বহুমুখি উন্নয়নের উপর। ভোট সর্বস্ব রাজনীতির পাশাখেলায় সেই ভবিষ্যৎ অন্ধকার হলে আমাদের সন্তানরা মার্কসবাদী বা মমতা কাউকে ক্ষমা করবে না। সিঙ্গুরের সিঁদুরে মেঘ সেই অশনিসঙ্কেত দিয়েছে।

পঞ্চাশটি নামের আড়ালে সিমি

(১ পাতার পর)

নিয়ে কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারী ইত্যাদি পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতে এরা থাবা বসাতে চলেছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে তারা দেদার অর্থ সংগ্রহ করছে। ওই অর্থ দিয়েই মেধাবী ছাত্রদের নিজেদের সুবিধা মতো ব্যবহার করছে।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণের উদ্ধৃতি অনুযায়ী, সিমি এদেশে বেশ কয়েকটি সংগঠনের মাধ্যমে নীরবে কাজ করে চলেছে। তারা ক্যাডার প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান বাদে অন্য দেশগুলিতেও নিয়মিত ক্যাডার পাঠাচ্ছে ভারত থেকে। একই সঙ্গে আল-কায়েদার মাধ্যমে সিমি অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহও জোর কদমে করছে। অদূর ভবিষ্যতের এই দুই কর্মপন্থার সংযোগ ভারতের পক্ষে ভয়াবহ কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট। গোয়েন্দাদের সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে গত ৫-৭ জুলাই উজ্জয়িনীতে এরা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। যার আসল উদ্দেশ্য ছিল সিমির আড়ালে চলা সংস্থাগুলির কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা। সেখানে তারা ঠিক করে যে উত্তর ভারত থেকে মুসলিম ছাত্রদের প্রশিক্ষণের জন্য তারা অন্যত্র পাঠাবে এবং তারপর তারা এইসব স্বেচ্ছাসেবীদের পড়াশুনার নামে দক্ষিণ ভারতে পাঠাবে।

গোয়েন্দারা যেসব নাম জানাতে পেরেছে যেগুলি হল তেহরিক-এ এহয়া উববত, তেহরিক অলাবা-এ আরিরিয়া, তেহরিক তাহাফুজ-এ শহরি, ওয়াদাও-এ ইসলামি ইত্যাদি। এছাড়াও খিদমত-এ খালাক, আমীর উল মুসলিমিন, জুহাপুরা ইয়ুথ ফেডারেশন, সৌহৃদ্যে লাইব্রেরি, ইত্তেহাদুল মুসলিমিন, নাওজওয়ান-এ-ইসলামি, মাইনরিটি রাইটস ওয়ার কোরাণ ফাউন্ডেশন, অল বেঙ্গল ইসলামিক স্টুডেন্ট ফেডারেশন, দারুল খুদা, ইয়ুথ কালচার ফোরাম ইত্যাদি নামেও এরা কাজ চালাচ্ছে।

ধর্মান্তরকরণের হিসাব দিন

(১ পাতার পর)

তো ১০-১২ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে সভাস্থলে পৌছান। ভুবনেশ্বরের রামমন্দির চত্বর থেকে সভাস্থল পর্যন্ত সাধুরা যে মৌনমিছিল করতে চেয়েছিলেন তাও বাতিল করে দেওয়া হয়। এই সব কিছু করে সরকার প্রমাণ করে দিচ্ছে একদিকে তারা বিধর্মীদের, হিন্দু সন্ন্যাসীর হত্যাকারীদেরই সংরক্ষক, আর অন্যদিকে হিন্দু সাধু-সন্তদের প্রতি উৎপীড়কের ভূমিকায়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ওড়িশা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক গৌরীপ্রসাদ রথ বলেছেন, সরকার পক্ষপাতমূলক দলগত রাজনীতি করছেন। যদি ভবিষ্যতে এই সরকার ভুবনেশ্বরে কোনও মিছিলের অনুমতি দেন তাহলে তাদেরকে যে কোনও ঘটনার জন্য দায়ী হতে হবে।

ওড়িশায় ফ্রীডম্ অফ্ রিলিজিয়ন অ্যাক্ট-১৯৬৭ থাকার পরও কেন খ্রীষ্টান মিশনারীরা গরীব-আনপড় জনজাতিদেরকে খ্রীষ্টমতে মতান্তরিত করছে, তার জবাবদিহি বিজেপি-বিজেডি সরকারকে করতে হবে বলে সাধু-সন্তরা দাবি জানিয়েছেন। আবার গোহত্যা নিষেধ আইন ১৯৬০-এ বলবৎ থাকার পরও জনজাতি প্রধান জঙ্গল এলাকায় ব্যাপকহারে নিয়মিত গোবধ-গোহত্যা ঘটে চলেছে সরকারের গোচরে থাকা সত্বেও। এই প্রশ্নে সরকারকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন পুরীর জ্ঞানপীঠ মঠের পীঠাধীশ স্বামী সচ্চিদানন্দ মহারাজ। তিনি সরকারকে প্রত্যেক এলাকার তহশীলদারদের কাছ থেকে প্রতি মাসে ধর্মান্তরকরণের হিসাব নিয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবি জানান। শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় হাতে গোনা কয়েকজন বিজেপি এম এল এ ছাড়া কোনও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতাকে দেখা যায়নি। আর এইসব জনজাতিদের ধর্মান্তরকরণ এবং গোহত্যার বিরুদ্ধে ওই এলাকাতেই আশ্রম গড়ে রুখে দিচ্ছিলেন বলেই স্বামী লক্ষ্মণানন্দজীকে যে হত্যা করা হয়েছে তা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।

পরদিন অর্থাৎ ৭ সেপ্টেম্বর ওই কন্ধমাল জেলার চকাপাদে স্বামী লক্ষ্মণানন্দের মূল আশ্রমে তাঁর পারলৌকিক যোড়শ ক্রিয়া এবং সমাধি দেওয়া হয়। ভুবনেশ্বর থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে চকাপাদে সরকারি নিষেধাজ্ঞা ১৪৪ ধারাকে তোয়াক্কা না করেই প্রায় দশ হাজার জনজাতি বনবাসী গ্রাম, গ্রাম থেকে দশ-পনেরো কিমি পায়ে হেঁটেও অনুষ্ঠান স্থলে পৌছান। একই রকমভাবে এসে পৌছেছিলেন প্রায় ১৫০০ জন সাধু সন্তও। সরকার ওখানে সভা যাতে না হয়, মানুষ যাতে যেতে না পারে সেজন্য সবরকম চেষ্টা করেছে। রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। ভুবনেশ্বর থেকে ১৫টি গাড়ির এক কনভয় বিশেষ অনুমতিপত্র সহ রওনা দিয়েছিল ৬ সেপ্টেম্বর বিকেল তিনটায়। ইচ্ছাকৃত সরকারি বাধাদানের ফলে সেই গাড়িগুলো গিয়ে পৌছায় রাত তিনটায়। অর্থাৎ মাত্র ৩০০ কিমি রাস্তা যেতে কনভয়ের সময় লেগেছিল বারো ঘন্টা। স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক করেন্দ্র মাঝি ও তাঁর সমর্থকদের সেখানে যেতেই দেয়নি সরকারি পুলিশ প্রশাসন। এম এল এ শ্রী মাঝি দশ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে স্বামীজীর চকাপাদ আশ্রমে পৌছান। সমাধিস্থলের মাটি নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ যে কলসযাত্রার আয়োজন করেছিল তাও প্রশাসন করতে দেয়নি। সাধুদের মন্ত্রপাঠে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় সরকার বিশেষ শস্ত্রধারী নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেছিল। সব মিলিয়ে নবীন পট্টনায়কের সরকারের ওড়িশা এখন অনেকটা কংস বা রাবণের রাজত্বে পরিণত হয়েছে।

কোলাঘাট লোক শিক্ষা নিকেতনের প্রকাশনায় মাতৃ আরাধনার প্রাক্ লগ্নে প্রকাশিত হলো —

মাতৃতন্ত্রের সাধনা ও ভাবনা

— ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য ৭০.০০ টাকা

সংকল্প প্রকাশনীর প্রকাশিত গ্রন্থ

- বাংলা সাহিত্যে স্বপ্ন তত্ত্ব ও অদৃষ্ঠবাদ — ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
- ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশ ও সমাজ চিন্তা — ডঃ বিজয় আঢ্য
- প্রাণ প্রবাহ — ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

বই তিনটি একত্রে নিলে ২০০ টাকায় পাওয়া যাবে। ২৬ নং বিধান সরণীতে ও স্বস্তিকা কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

গহনা যদি গড়াতে চান যে কোনও স্বর্ণকারকে

স্বপার

ক্যাটলগ দেখাতে বলুন

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স

১৫-ডি, গরাণ হাটা ষ্ট্রীট, কলি:-৬

HB®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

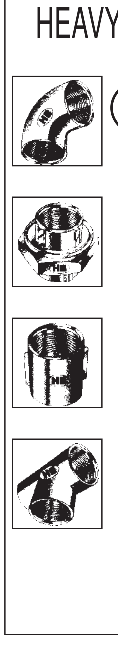

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

২২ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রসঙ্গ ঃ অনুপ্রবেশ

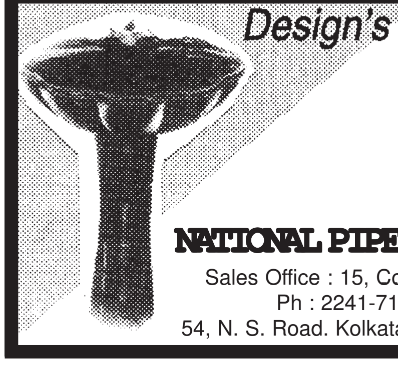

Design's For Modern Living

Neycer

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মিডিয়ার সেকুলারবাদ

ওড়িশার কন্ধমাল জেলায় স্বামী লক্ষ্মণানন্দের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সারা দেশের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে খৃস্টান মিশনারীদের হিংসাশ্রয়ী ষড়যন্ত্রকে একেবারে ফাঁস করিয়া দিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল, দেশের মানুষের চোখ ও কান বলিয়া দাবিদার সেকুলার সংবাদ মাধ্যম ওড়িশার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে হিন্দু সংগঠনগুলির উন্মত্ততা বলিয়া বর্ণনা করিতেছে। এই জঘন্য ঘটনার প্রকৃত ইতিবৃত্ত দেশের মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিবার দায়িত্ব আছে বলিয়া তাহারা মনে করে নাই। গত চারদশক ধরিয়া একজন সন্ন্যাসী কন্ধমাল জেলার বনবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সেবা কাজের মাধ্যমে খৃস্টান মিশনারীদের জোর জবরদস্তি করিয়া ধর্মান্তরকরণের ষড়যন্ত্র কীভাবে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন, সেই বিষয়ে যথাযোগ্য সংবাদ পরিবেশণে বিরত থাকিয়াছে। মিশনারীদের চোখের বালি এই যোদ্ধা সন্ন্যাসীর উপর গত কয়েক বৎসরে আটবার প্রাণঘাতী হামলা হইয়াছে। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ সংবাদ মাধ্যমের চোখে হিন্দুত্বের জাগরণ ধর্মীয় উন্মাদনা মাত্র। আর চার্চের রাষ্ট্র বিরোধী তৎপরতাকে সেবা ভাবে উদ্বুদ্ধ মানবিক রূপ বলিয়া সংবাদ মাধ্যমে বর্ণনা করা হইয়াছে।

স্বামী লক্ষ্মণানন্দের নির্মম হত্যাকান্ড লইয়া সংবাদ মাধ্যম নিন্দাজনক একটি শব্দও লেখে নাই, বলেও নাই। অন্যদিকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহকে গ্রাহম স্টীংস হত্যার পুনরাবৃত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। আর এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করিয়া স্টীংস হত্যার পুরাতন দৃশ্যগুলির বর্ণনা ও প্রদর্শন করিতেছে। প্রশ্ন হইল— প্রকৃত ঘটনা হইতে সংবাদ মাধ্যমের সত্য কি আলাদা? আসল ঘটনা তো হইল এই — বনবাসীদের কাছে স্বামী লক্ষ্মণানন্দ ছিলেন দেবতুল্য পুরুষ। তিনি একথাই বলিতেন — আমি প্রাণ দেবো, কিন্তু নিজের ধর্ম ছাড়িব না। আমরা সেবা কাজে বিশ্বাসী, হিংসায় নয়।' কিন্তু সেবার আড়াঁলে হিংসায় মদতকারী চার্চ স্বামীজীর এই সেবাভাবনা যুক্ত কাজকর্মকে নিজেদের পথের কাঁটা হিসাবে দেখিয়াছে। জোরজবরদস্তি করিয়া ধর্মান্তরকরণের যে কুৎসিত ষড়যন্ত্র তাহারা করিয়াছে, স্বামী লক্ষ্মণানন্দকে সেই কাজ হাসিলের পথে বাধা জানিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার বারবার চেষ্টা করিয়াছে। ফ্লোরিডা (আমেরিকা)-র বিশিষ্ট সাংবাদিক হেলন হেলর তাঁর রচিত 'দ্য ডার্ক সাইড অফ ক্রিশ্চিয়ন হিস্ট্রি'-তে লিখিয়াছেন — গত দু'হাজার বছরে চার্চ প্রায় একশো সভ্যতাকে ধবংস করিয়া দিয়াছে, ১৫০ কোটি মানুষকে হত্যা করিয়াছে, এক কোটি মহিলাকে 'ডাইনি' বলিয়া হত্যা করিয়াছে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী চার্চ নিজেদের অমানবিক, অরাষ্ট্রীয়, অসাংবিধানিক রূপ প্রকাশ করিয়াছে। স্বামীজী চার্চের এই চেহারাটা মানুষের কাছে তুলিয়া ধরিতেন। চার্চের কাছে এই অপ্রিয় সত্য ছিল অসহনীয়। ভারতের সংবিধান অনুসারে ব্যক্তি বা সমাজের নিজেদের মৌলিক পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিবার অধিকার আছে এবং সরকারেরও সেই অধিকার বজায় রাখা কর্তব্য। চার্চ কিন্তু এই অধিকারকে স্বীকার করিতে রাজী নয়। বরং উপেক্ষা করিতেই তৎপর।

ওড়িশা সরকার এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে কোনও কিছু জানিতেন না এমন নহে। কেননা গত বছর ডিসেম্বরেই স্বামীজীর উপর প্রাণঘাতী হামলা হইয়াছিল। দৈবক্রমে সেই সময় তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়। অথচ ওড়িশা সরকারের এই বিষয়ে কোনও হেলদোল লক্ষ্য করা যায় নাই। স্বামীজী কিন্তু ইহাতে ভীত হন নাই। আপন ব্রতে অটুট থাকিয়া কাজ চালাইয়া যাইতেছিলেন। শেষপর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নিজের প্রাণ দিয়াছেন। কন্ধমাল জেলার মিশনারীদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ জানিবার জন্য যদি ১৯৭১ হইতে ২০০১ পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের দিকে লক্ষ্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ওই জেলায় খৃস্টান জনসংখ্যা ৬ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ২৭ শতাংশে দাঁড়াইয়াছে। এইকথা আজ আর অজানা নয় যে ধর্মান্তরকরণের ফলে শুধু পূজাপদ্ধতির পরিবর্তন হয় না, রাষ্ট্রীয়তারও পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিরোধী মানসিকতাও তৈরি হয়। স্বামী বিবেকানন্দ এই জন্যই বলিয়াছেন, একজনের উপাসনা পদ্ধতি বা ধর্মমত পরিবর্তনের ফলে সমাজে শুধু যে একজন সংখ্যা কমিল তাহা নয়, একজন শত্রুও বাড়িল। তাই চার্চের সঙ্গে এইসব রাষ্ট্রবিরোধীদের জোট হওয়া স্বাভাবিক এবং চার্চ যে এইসব হিংসাত্মক ঘটনায় মদত দিচ্ছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুত্বনিষ্ঠ সংগঠনগুলি নানা সেবা কাজ করিয়া চলিতেছে। আর এই কাজের মাধ্যমে জনজাতি সমাজের মধ্যে স্বাভিমান, আত্মপরিচয় ও রাষ্ট্রীয় ভাব জাগ্রত হইতেছে। তাহাদের উপর আর মিশনারীদের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ থাকিতেছেনা। ধর্মান্তরকরণের কাজে বাধা হইয়া দাঁড়াইতেছে। মিশনারীদের ক্রোধের কারণ তাহাই।

ওড়িশা সরকার এবং প্রশাসন যে স্বামী লক্ষ্মণানন্দ হত্যাকারীদের মাওবাদী বা নকশালবাদী বলিয়া চিহ্নিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, সত্যি কথা বলিতে কী, নিজেদের মুখ রক্ষা করিতেই তাহাদের এই প্রয়াস। প্রত্যেক বিষয়েরই ত্রুটি-বিচ্যুতির সুলুক সন্ধান করিতে যে সংবাদ-মাধ্যম তৎপর, তাহারা নিজেরাই কেন এই ব্যাপারে সত্য উদ্‌ঘাটন করিতেছে না? তাহার কারণ কি এই — সেকুলারবাদের চশমা পরিয়া তাহারা চার্চের উপর আক্রমণকে মানবতার উপর আঘাত বলিয়া দেখিতেছে এবং অন্যদিকে স্বামী লক্ষ্মণানন্দের মতো হিন্দু জাগরণের পুরোধা সন্ন্যাসীর হত্যাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতেছে। সংবাদ মাধ্যমের এই সেকুলারবাদ কতখানি রাষ্ট্র ও দেশবিরোধী তাহা বোঝা অত্যন্ত জরুরী। কেননা রাষ্ট্র জাগরণে গণতন্ত্রের চতুর্থ পরিসর সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আলুবর্ষে আলুচাষীদের আত্মহত্যা

গোপীনাথ দে

২০০৮ খৃস্টাব্দকে রাষ্ট্রপুঞ্জ আলুবর্ষ হিসাবে গণ্য করেছেন। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ধুমধাম করে বর্ষ সূচনাতে আলু বর্ষ পালনের ব্যবস্থা করে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। অথচ এই আলুবর্ষেই পশ্চিমবঙ্গের আলু চাষীদের এমনই অবস্থা যে আলুর উপযুক্ত দাম না পেয়ে দেনার দায়ে আলু চাষীরা আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। এর থেকে ভাগ্যের পরিহাস আর কী হতে পারে যে, আলু বর্ষে আলুচাষিরা আত্মহত্যা করছে!

পশ্চিমবঙ্গে এই বৎসর (২০০৭-০৮ সালে) আলু উৎপন্ন হয়েছে প্রায় ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার একথা বলছেন। কিন্তু আলু রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গে হিমঘর আছে মোট ৩৮২ টন।

চাষের খরচ না ওঠায় চাষীরা আলু ফেলে দিচ্ছে।

এইসব হিমঘরে আলু রাখা যেতে পারে প্রায় ৫১ লক্ষ মেট্রিক টন। পশ্চিমবঙ্গে মানুষের জন্য সারা বছরে আলুর প্রয়োজন প্রায় ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনের সবটা রাখার ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে নেই। এর মধ্যে কয়েকটা হিমঘর আবার শ্রমিক অশান্তির জন্য বন্ধ আছে। ফলে আলু চলে যায় ভিন্‌ রাজ্যের হিমঘরে। এবং কয়েকমাস পরে যখন পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন হয় তখন আবার ঐ আলু ভিন রাজ্যের হিমঘর থেকে ফিরে আসে, তখন ক্রেতাদের বেশি দামে কিনে আলু খেতে হয়। অর্থাৎ ৩১ বছর বামফ্রন্ট শাসনে পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনের সবটুকু আলু রাখার ব্যবস্থা করতে পারেনি এই সরকার।

আলু উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে বীজ আলু উৎপন্ন হয় না। সেই কারণে পাঞ্জাব ও মানালি থেকে বীজ আলু আসে পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ বীজ আলুর মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সরকার নির্বিকার। এবং সরকার বীজ আলু উৎপাদনের কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ফলে উৎপাদন মার খাচ্ছে। এ বৎসর বীজ আলুর দামও অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যে হুগলী, বর্ধমান ছাড়াও বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রচুর পরিমাণে উন্নত মানের আলু চাষ হয়। কিন্তু উন্নত মানের বীজের অভাবে আলুর মান নিম্নগামী। কিছুদিন যাবৎ শোনা যাচ্ছে, হুগলীর চাঁপাডাঙ্গায় একটি বীজ আলুর পরীক্ষাগার তৈরি করবে সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রকারের ঘোষণা মাঝে মধ্যেই শোনা যায়। এক এক বছর আলুর দাম এত কমে যায় যে তখন চাষিরা মাঠ থেকে আলু তুলে আনে না, কারণ তখন চাষীরা আলু বিক্রি করে যে অর্থ পায় তা দিয়ে আলু তোলার খরচও মেটান যায় না। তখন মাঠের আলু মাঠেই পড়ে থাকে। চাষী দেনার দায়ে আত্মহত্যা করে। তখন সরকার থেকে বলা হয় — "আলু বিদেশে রপ্তানি করা হবে, আলু থেকে অ্যালকহল করা হবে, আলু থেকে আলুর পাউডার করা হবে" ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর বছর ঘুরে গেলে যাকে— তাই।

অপর দিকে হিমঘরে আলু রাখার ভাড়া অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। হিমঘরের মালিকদের বক্তব্য হল — হিমঘর ঠিকঠিক ভাবে ঠাণ্ডা রাখলে তবেই আলু ঠিক থাকে, নচেৎ আলু পচে নষ্ট হয়ে যায় বা কলা ফুটে যায়। তাই লোড্‌শেডিং-এর মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বাধ্য হয়েই জেনারেটার চালিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে ঠাণ্ডা রাখার মেশিন চালু রাখতে হয়। ফলে প্রচুর পরিমাণে ডিজেল, মবিল তেল ইত্যাদি কিনতে হয় এবং এইভাবে একটা মাঝারি সাইজের হিমঘরের জন্য বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকার ডিজেল মবিল ইত্যাদি লাগে। যদি লোড্‌শেডিং না হত, তাহলে তেলের খরচটা বাঁচত এবং বছরে কেবলমাত্র বিদ্যুৎ-এর বিল ৫/৬ লক্ষ টাকার মেটালেই চল্‌ত অর্থাৎ খরচের অনেক সাশ্রয় হত। তাহলে হিমঘরে রাখার জন্য আলুর ভাড়া না বাড়ালেও চলত। তাই যেহেতু লোড্- শেডিং-এর জন্য হিমঘরের খরচ বেড়েছে তাই ভাড়াও বেড়েছে এবং তার গুনাগার দিতে হচ্ছে আলু চাষিকে। প্রতি ৫০ কেজি প্যাকেটে হিমঘরের ভাড়া চাষীকে দিতে হচ্ছে ৪৬/৪৭ টাকা এবং ৫০ কেজি আলু হিমঘরে রাখলে চাষী পাবে ৪৭ কেজি। খোলাবাজারে আলু পাঁচ টাকা কেজি বিক্রি হলেও চাষী কিন্তু ৫০ কেজি আলু ৬০ টাকা (প্রায়) দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে চাষীর উৎপাদন মুল্যটুকুও উঠছেনা, ফলে দেনার দায়ে আলু চাষী অতিষ্ঠ।

আলু চাষে প্রচুর পরিমাণে সার লাগে। তাই প্রতি বছর আলু চাষের শুরুতে সারের আকাল দেখা দেয়, ব্যবসাদাররা অতিরিক্ত দাম চেয়ে বসে। আলু নিয়ে উদ্ভুত পরিস্থিতির উপর রাজ্য সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। রাজ্য সরকারের ভুলের ফয়দা তুলছে এক শ্রেণীর দালাল। রাজ্য সরকার তেলা মাথায় তেল দিচ্ছে। পরিবহনে ভর্তুকি দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত তারা দিয়েছে তাতে শুধুমাত্র ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হবে। চাষিদের কোনও লাভ হবে না। ভিন্‌ রাজ্যে আলু পাঠানোর জন্য কুইন্টাল প্রতি ২০ টাকা করে ভরতুকি ঘোষণার পর এক বস্তা (৫০ কেজি) আলুর ফ্রি বন্ডের দাম ৭৫ টাকা থেকে বেড়ে ২০০ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু তার পর আবার নামতে নামতে ৬০ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের ছোট আলু ব্যবসায়ী ও চাষীরা এর জন্য সরকারের ভুল নীতিকেই দায়ী করেছেন। কারণ পরিবহনে ভরতুকি দেওয়ায় চাষীর কোনও লাভ হয়নি।

সারের দাম এখন বেশ চড়ে বসেছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী মরশুমে চাষীরা আদৌ আলু চাষে নামবে কি না তাতে রয়েছে প্রশ্নচিহ্ন। ১৯৯৭ সালে আলুর বিপর্যয়ের পর এমন দৃশ্যই দেখা গিয়েছিল ১৯৯৮ সালে। ১৯৯৮ সালে আলু চাষ একদম তলানিতে ঠেকেছিল।

সম্প্রতি চাষে কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ মুকুব করলেও এখন ভাবতে হবে আলুচাষ নিয়ে। আলুচাষিদের ঋণের সবটা মুকুব হবে কি না।

বাজারে আলুর চাহিদা নেই, যেখানে বা যে যে প্রদেশে বা স্থানে চাহিদা আছে, সে সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই। এবং আলু পাঠানোর কোনও ব্যবস্থা নেই।

বাইরের দেশগুলিতে যেখানে যেখানে আলুর চাহিদা আছে, সেখানে আলু রপ্তানির সমস্যা দূর করা হচ্ছেনা। আরব দেশ গুলিতে ও ফিলিপিনসে আলুর দাম ৫০ টাকা কিলো ভারতীয় মুদ্রায়। সেখানে ভারতের নানা জিনিস বিক্রি করা হয়। কিন্তু আলু নয় কেন?

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক আবহাওয়া আলু চাষের পক্ষে অনেকটা ভাল অথচ যথেষ্ট হিমঘর নেই, যথাযথ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা নেই, বিপণনেও নানা সমস্যা। ফলে আলু চাষীরা মার খাচ্ছেন এবং মারা যাচ্ছেন আন্তর্জাতিক আলুবর্ষে।

আত্মপরিচয়ের স্পষ্ট ধারণার অভাব

(২ পাতার পর)

পরম্পরাগত।

উত্তর কলকাতায় কেশব ভবনে আয়োজিত উৎসবের সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী আশিষ দত্ত বলেন আমরা ভারতবাসী, সঙ্ঘ আমাদের দেশ ভারতবর্ষকে ভালবাসতে শেখাচ্ছে। উৎসবে পূর্ব ক্ষেত্রের সঙ্ঘচালক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক অমিত মুখার্জী, মহানগর কার্যবাহ সুশীল রায়, উত্তর কলকাতা বিভাগ সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী সহ বহু বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ কলকাতায় উৎসবে সভাপতিত্ব করেন বৌদ্ধ দার্শনিক আশীষ গাঙ্গুলী। তিনি সঙ্ঘের অনুশাসনের প্রশংসা করে বলেন, সঙ্ঘ বিপদের সময় এগিয়ে যায়। যারা সঙ্ঘকে 'ফ্যাসিস্ট' বলে, তাদের কাছে বক্তব্য, ভারতবর্ষকে ভালবাসলে যদি 'ফ্যাসিস্ট' হতে হয়, সঙ্ঘ তবে তাই। অনুষ্ঠানে দক্ষিণ বিভাগের বিভাগ সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ মুখার্জী সকলকে ধন্যবাদ জানান।

এই সময়

পট্যাটো ইয়ার

আলু খাওয়া নিয়ে যারা ভয়ে থাকেন তাদেরকে এবার অভয় দিতে এগিয়ে এলেন পশ্চিমবঙ্গ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এবং এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী মোরতাজা হোসেন। জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক চলতি বছরকে 'ইন্টারন্যাশনাল পট্যাটো ইয়ার' ঘোষণার কথাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, একদিকে দুর্মূল্যের বাজারে আলু যেমন সস্তা তেমনি উৎপাদনও বেশ ভাল। অন্যদিকে পর্যাপ্ত ক্যালরি তো আছেই, চর্বি জাতীয় সমস্যা একেবারেই নেই আলুর ক্ষেত্রে। তাই আলুর সপক্ষে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। প্রসঙ্গত আয়ারল্যান্ডের দুর্ভিক্ষের সময় আলু কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল বলে কৃষি বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

অর্থনৈতিক পটপরিবর্তন

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ দেশগুলির সামনে ভবিষ্যত খুব খারাপ। এরকমই অশনি সংকেত ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের। তাদের মতে বিশ্বায়নের বাজারে তৃতীয় বিশ্বের বৃহৎ জনসংখ্যার দেশগুলি অবতীর্ণ হওয়ায় অর্থনীতির হালহকিকৎ বদলে যাচ্ছে। তাছাড়া বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপ ও আমেরিকার মতো সমৃদ্ধ দেশগুলির অর্থনীতি ক্রমে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ধীর গতিতে হলেও তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ণশীল দেশগুলি আর্থিক সমৃদ্ধির দিকে এগোচ্ছে।

বাম বিপদের হুশিয়ারি

কমিউনিষ্টদের চরিত্র জাতীয়তা বিরোধী। তাই ওদের সঙ্গে যেকোনও চুক্তি বা বোঝাপড়া করতে গেলে ভাল করে সবদিক খতিয়ে দেখা উচিত। এমনই মন্তব্য করলেন জনতা পার্টির সভাপতি সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী। সম্প্রতি চেন্নাইতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, টাটাদের উচিত ওদের ফাঁদে পা না দেওয়া। কেননা, ওরা ছলে-বলে-কৌশলে গরীবের স্বার্থ, অর্থনৈতিক স্বার্থ ইত্যাদি গালভরা নানা তত্ত্ব সামনে রাখলেও প্রকৃতপক্ষে দলীয় স্বার্থই ওদের কাছে মুখ্য। অতীতেও দেখা গেছে, জাতীয় স্বার্থের চাইতেও দলীয়স্বার্থকে চরিতার্থ করতেই তারা ব্যস্ত। তাই কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে সকলকে সাবধান হওয়া উচিত বলে ডঃ সুব্রহ্মণিয়ম মন্তব্য করেন।

সংশোধনাত্মক

কারাবন্দীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক তথা মানবিক গুণের বিকাশের লক্ষ্যে শ্রীমদভাগবতগীতা প্রচারের সিদ্ধান্ত নিল অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি তিরুমালা দেবস্থানম ট্রাস্টবোর্ড। এক বিবৃতিতে বোর্ডের চেয়ারম্যান বি কে রেড্ডি জানান, আগে তাদেরকে মন্দিরের প্রসাদ হিসাবে লাড্ডু দেওয়া হত যাতে তাদের মন ভাল থাকে। এবার থেকে গীতা দেওয়া হবে এবং তারা তা যাতে পড়ে এবং উপলব্ধি করার আগ্রহ বাড়ে তারও প্রচেষ্টা চালানো হবে।

জিন্না থেকে মুশারফ এবং আমেরিকা

শংকর পাল।। গত ৬১ বছর ধরে পাকিস্থানে টাগ অফ্ ওয়ার চলছে — একদিকে সেনা-শাসক অন্যদিকে সিভিলিয়ানরা, একদিকে মৌলবাদী গোঁড়া ইসলামপন্থীরা অপরপক্ষে অপেক্ষাকৃত উদার জনগোষ্ঠী। এই জাঁতাকলের মাঝে পড়ে দেশে গণতন্ত্র, গোঁড়া ধর্মীয় শাসন অথবা মিলিটারি একনায়কতন্ত্রের কোনটাই পুরোপুরি সার্থক হতে পারেনি। আকস্মিক ঘটনায় হতাহতের ব্যাপারটা সেখানে যেন আইন-শৃঙ্খলার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয় সংহতির বিষয়টা এই পরিবেশে সভ্য সমাজের কাছে গভীর উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম ক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ তালিবানীকরণ ঘটেছে। অরাজক অবস্থা সেখানে চরমে। দক্ষিণ-পশ্চিম বালুচিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

এরই মাঝে জনগোষ্ঠীগত বিচ্ছিন্নতাবাদী অস্থিরতা দুটো বড় প্রদেশেই উত্তেজন পূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে পাঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশে। পাঞ্জাব দেশের শস্য ভাণ্ডার ও সিন্ধু ব্যবসা বাণিজ্যর কেন্দ্র। অথচ দুটো রাজ্যেই বছর জুড়ে অস্থিরতা বিরাজ করেছে।

এখন প্রশ্ন উঠছে, এই সকল ভয়াবহ পরিস্থিতি কীভাবে সৃষ্ট হল?

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাদি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। এক গণতান্ত্রিক সংসদীয় পদ্ধতিতে জনমতের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেশটির মানচিত্রে উদয় সম্ভব হয়েছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করতেই পারত। আবার 'ইসলামি আমীরশাহী'ও হতে পারত। 'পাকিস্তান' আন্দোলনের মূল ভাবনা ছিল — ভারতের মুসলমানরা এক আলাদা জাতি এবং তাদের একটা রাজনৈতিক ভূখণ্ড পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা মুসলিমদের জন্য আগেই আলাদা পরিচিতি, নির্বাচন ক্ষেত্র

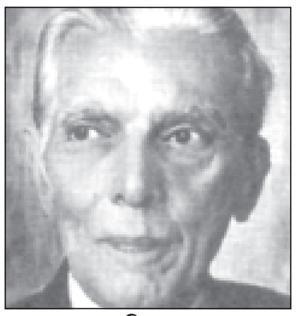
জিন্নাহ

দিয়েছিল। ১৯৩৭ এবং ১৯৪৬-এর নির্বাচনে তাদের স্লোগানই ছিল 'পৃথক মুসলিম পরিচয়', চাই মুসলিমদের জন্য আলাদা দেশ। সেই দিনগুলোতে মুসলিম নেতারা যেন তেন প্রকারেণ রাজনীতি, ধর্ম ও আইনগত দাবিকে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে একাকার করে দেন। তারই ফলশ্রুতি আজকের পাকিস্তান। এই পদ্ধতির প্রথম বলিই হল গণতন্ত্র। এর ভিত কেঁপে উঠেছিল দেশের প্রথম গভর্ণর জেনারেল জিন্নাহ্‌র দুটো বিতর্কিত সিদ্ধান্তে।

তিনি প্রথম সুযোগেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের সরকারকে ভেঙে নতুন করে নির্বাচন না করেই এক মুসলিম লীগ নেতাকে মুখ্যমন্ত্রীর গদীতে বসিয়ে দেন। দ্বিতীয় অবিমৃশ্যকারী সিদ্ধান্ত ছিল পূর্ব পাকিস্তান বা ঢাকার বিরাট সংখ্যক বঙ্গভাষীদের উপর উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া।

১৯৫৩ সালে গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদ (একজন প্রাক্তন আমলা) দেশের প্রথম অসামরিক সরকারকে বরখাস্ত করে দেন। তখন থেকে শুরু করে গভর্ণর জেনারেল, রাষ্ট্রপতি এবং সেনাপ্রধানরা অন্তত দশটি অসামরিক সরকারকে বরখাস্ত করেছে। ওই দশটি সরকার সাকুল্যে ২৭ বছর রাজত্ব চালিয়েছে। আর তেত্রিশ বছর পুরোটাই সরাসরি সামরিক শাসন চলেছে।

জিন্নার দ্বিতীয় পদক্ষেপের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের উপরে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের একাধিপত্য আইনের ফাঁদে ফেলে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় বেশি ছিল। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর পাক সামরিক শাসকরা বারবার দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ও সংসদীয় চরিত্রকে পঙ্গু করে দিয়েছেন। তিনটি ছোট ছোট প্রদেশকেই প্রায় বিচ্ছিন্ন করেছেন। নিপীড়ন চাপা দিতে আইনী রক্ষাকবচের সাহায্য নিয়েছেন। ১৯৫৪ সালেই পাক সুপ্রীম কোর্ট গভর্ণর কর্তৃক রাজ্য সরকার বরখাস্ত করাটা আইনগ্রাহ্য বলে এবং সংসদও বিতর্কিত 'প্রয়োজন'-এর তত্ত্ব খাড়া করে তাকে সমর্থন করে। প্রত্যেক বারই নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত করতে ওই 'প্রয়োজন'-এর তত্ত্বই দেখানো হয়। গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিকে তাকে তুলে রেখে উচ্চ বিচার বিভাগও একইনীতি তুলে ধরে।

আবার এদিকে সামরিক শাসকরা তাদের

মুশারফ

মদতপুষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও উগ্র ধর্মীয় ব্যক্তিদের তোষণ করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে। সামরিক শাসকদের নির্দেশে তথাকথিত অসামরিক সরকার কাজ করে। তারা হল সামরিক প্রশাসনের মুখোশ। অনেকবার ধর্মীয় ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর উগ্রবাদীরা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।

এছাড়া আমেরিকাও তাদের স্বার্থে পাক-সামরিক শাসকদের অর্থ ও সামরিক সাহায্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে। পদ্ধতি খুবই পরিষ্কার। এই সহায়তার প্রক্রিয়া আমেরিকা আরম্ভ করেছিল সেই ১৯৫৩ সাল থেকেই। তখনই প্রথমবার সিভিল সরকারকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। সেই সামরিক শাসন পাকিস্তানে একটানা দশবছর চলেছিল। তখন আমেরিকা রাশিয়া বিরোধী কূটনীতি করতে পাকিস্তানকে অনেক বিলিয়ন ডলার বিলিয়ে দেয়। এরপর ১৯৭৭ সালে আবার অন্য এক সামরিক শাসক ক্ষমতায় আসে। আফগানিস্তানে উপস্থিত রাশিয়ান সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার সিদ্ধান্ত হয় এবং আফগানিস্তানের তালিবানীকরণ হয়। আমেরিকান সমরাস্ত্র পাকিস্তানের হাত দিয়ে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আফগানদের হাতে পৌঁছাতে থাকে। সেই সকল অস্ত্রই বর্তমানে আফগানরা আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। আবারও ১৯৮৮-৯৯ একদশক ধরে আমেরিকা পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দিয়ে গেল। ফল হল, ১৯৯৯-এ নীরব অভ্যুত্থানে সেনা প্রধান পারভেজ মুশারফ মসনদে বসে পড়লেন, নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে গদীচ্যুত করলেন। আর আমেরিকা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে ঢালাও সামরিক সাহায্য দিয়ে চলল।

এরপর দেখা গেল মুশারফ সম্পর্কে আমেরিকার মোহভঙ্গ ঘটল। ঠিক যেমনটা আয়ুব খানকে নিয়ে হয়েছিল। ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের পর। তখন সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছিল সেনাপ্রধান জিয়াউল হকের নেতৃত্বে। এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৮৭ সালে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে পাকিস্তানে সেকুলার ও গণতান্ত্রিক মনোভাব দানা বাঁধেনি, উল্টে কোণঠাসা অবস্থায় পড়ে যায়। গত ছয় দশক ধরে একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে।

এজেন্টদের প্রতি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা (১৪১৫)-র বিজ্ঞাপন গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। আশা করি, আপনাদের তা নজরে এসেছে। যে সকল এজেন্ট এখনও তাঁদের প্রয়োজনীয় পূজা সংখ্যার অর্ডার দেননি, তাঁরা সত্বর কপি বুক করুন। যথাসময়ে অর্ডার না পেলে নিয়মিত সংখ্যার মতো স্বস্তিকা পূজা সংখ্যাও পাঠানো হবে। অতিরিক্ত কপি পাঠানো সম্ভব হবে না।

আগস্ট ২০০৮ পর্যন্ত বিলের বকেয়া টাকা পূজা সংখ্যা পাঠানোর আগেই পরিশোধ করুন, যাতে পূজা সংখ্যা পাঠাতে আমরা অসুবিধায় না পড়ি।

—কার্যাধ্যক্ষ, স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা ও বার্ষিক গ্রাহক

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ ৩১.১০.২০০৮ তারিখে বা তার আগেই শেষ হচ্ছে, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণের জন্য বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০.০০ টাকা ২২.৯.২০০৮ তারিখের মধ্যে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে ডাকযোগে সরাসরি "Swastika" নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট বা মনিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকা কার্যালয়ে পাঠান বা স্থানীয় প্রচার প্রতিনিধির কাছে জমা দেন।

টাকা জমা দেবার এক মাসের মধ্যে সবুজ পাকা রসিদ না পেলে স্থানীয় প্রচার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বা সরাসরি স্বস্তিকা কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

—কার্যাধ্যক্ষ, স্বস্তিকা

সকল প্রকার স্টীল ফার্নিচারের জন্য যোগাযোগ ক(ন
Dass Steel Co.
Mirchak Road.-Malda
Ph. No. 266063

প্রকাশনী
95%

Ganesh Raut (B.Com)
Govt. Authorised Agent L.I.C.I.
Contact For Better Service
2521-0281, 94323-05737

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!
অ(য় কুমার পালের ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

রাজ্য রাজনীতি

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা সি পি এমের

নিশাকর সোম

রাজ্যে বর্তমানে একটি বিষয় নানাভাবে নানাজনে আলোচনা করছেন। সেটি হল সিঙ্গুর-এর টাটা মোটরস-এর প্রকল্প। বর্তমানে অবস্থাটা হল এই রকম — (১) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বক্তব্য হল জমি ছাড়া যাবে না। (২) মমতা ৪০০ একর জমি ছাড়ার দাবিতে অনড়। (৩) টাটারা নিরাপত্তার অভাবে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে।

বুদ্ধবাবু চন্দনগরে এক অনুষ্ঠানে বলেছেন যে সিঙ্গুর নিয়ে তিনি নাজেহাল হয়ে গেছেন।

প্রশ্নটা হল, এ-অবস্থা সৃষ্টির জন্য মূলতঃ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুই দায়ী। তাঁর মনোভাব প্রথমেই ছিল আমার ২৩৫, ওরা ৩০। আমরা জোর করেই সিঙুরে মোটর কারখানা স্থাপন করে দেব। এই মনোভাব থেকেই তিনি এবং শিল্পমন্ত্রী টাটাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন — বিরোধীদের শক্তি নগণ্য। নস্যাৎ করে দেওয়া যাবে। পরবর্তীকালে সিঙ্গুরে মমতাদের ধর্ণা দেখে টাটা মনে করেন — বিরোধীদের সম্পর্কে তাঁদের সঠিক মূল্যায়ণ জানানো হয়নি। রতন টাটা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে নিরাপত্তা হীনতার কথা বলেছেন। টাটার কাজ বন্ধ করার জন্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান এবং সিপিএম-এর পলিটব্যুরো সদস্য — তথা রাজ্য সম্পাদক উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

এখন সিঙ্গুর সমস্যা মেটানোর ব্যাপারে রাজ্যপাল উদ্যোগ নিয়েছেন। তাতে মমতা ব্যানার্জি খুশি। বুদ্ধবাবু সব গিলে মেনে নিয়েছেন। আলোচনাতে প্রাক্তন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জি থাকছেন। আলোচনায় জমি ছাড়ার প্রশ্নটা বিরোধীরা তুলছেন। সরকার বিকল্প জমি দেবার কথা বলছেন। এসব দেখে একটা কথাই মনে আসছে তা'হল — "সেই তো মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি?"

সিপিএম-এর অবস্থা হল ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

এই ফাঁকে সর্বদলীয় সভা বন্ধ করে দেওয়া হল। অথচ সর্বদলীয় সভা ডাকার ব্যাপারে বামফ্রন্ট মত দিয়েছিল। বুদ্ধবাবু নাকি বিরুদ্ধে ছিলেন তাই তিনি বামফ্রন্টের সভায় অনুপস্থিত ছিলেন!

আসলে বুদ্ধবাবু সমালোচনার সামনে আসতে ভয় পাচ্ছেন। তিনি নিজেই বুঝেছেন যে তাঁর জন্যই এই জটিল আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে।

তবে সিঙ্গুর সমস্যার যদি কোনও সমাধান হয়, তবুও সর্বদলীয় সভার দাবি সরব করে তুলতে হবে।

একটা কথা পরিষ্কার নন্দীগ্রামের ঘটনা থেকে বুদ্ধবাবুরা কোনও শিক্ষাই নেননি। বুদ্ধবাবুর ঔদ্ধত্য ও প্রগলভতা অত্যন্ত বেশি। মনে রাখা দরকার হলদিয়া অথরিটির জমিগ্রহণের নোটিশ যেটি লক্ষ্মণ শেঠ বুদ্ধবাবুকে নাকি জানিয়ে জারি করেছিলেন তাতেই জমি অধিগ্রহণের কথা ছিল। পরে বুদ্ধবাবু চাপে পড়ে হালকা ভাবে বলেন 'ওই বিজ্ঞপ্তি ছিঁড়ে ফেলুন।'

সিঙ্গুর-এর প্রকল্প নিয়ে পার্টির রাজ্য কমিটি বা সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি। শুধু তাই নয়, তাদেরকে ঘুণাক্ষরেও বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা হয়নি। যা করবার তা করলেন — বুদ্ধবাবু, নিরুপমবাবু আর শিল্প সচিব সব্যসাচী সেন। তাই গোড়া থেকেই রাজ্যের ভূমি রাজস্বমন্ত্রী প্রকাশ্যে নিজস্ব মত ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠ পার্টি অনুশাসনে বন্ধ করে দেওয়া হল। পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় গৌতম দেব বললেন 'আমি কি সম্পাদকমণ্ডলীতে আছি? আমি তো কিছুই জানতে পারি না।'

> "এ-অবস্থা সৃষ্টির জন্য মূলতঃ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু দায়ী। তাঁর মনোভাব প্রথমেই ছিল আমার ২৩৫, ওরা ৩০। আমরা জোর করেই সিঙুরে মোটর কারখানা স্থাপন করে দেব। এই মনোভাব থেকেই তিনি এবং শিল্পমন্ত্রী টাটাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন — বিরোধীদের শক্তি নগণ্য। নস্যাৎ করে দেওয়া যাবে।"

রাজ্যের বামফ্রন্টেও কোনও আলোচনা হয়নি। কার্যত পার্টি, বামফ্রন্ট ও মন্ত্রিসভাকে কিছু না জানিয়ে বুদ্ধ-নিরুপম সব্যসাচীকে নিয়ে এগিয়ে চললেন। আনুষ্ঠানিক প্রথায় যদি পার্টিতে, বামফ্রন্টে এবং মন্ত্রিসভায় বিষদ আলোচনার পর সিঙ্গুরে জনগণকে বোঝানো এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বদলীয় সভা ডেকে প্রকল্পটি সম্পর্কে জানিয়ে মতামত চেয়ে এগোন হত তা'হলে আজকে বুদ্ধবাবুর এই ল্যাজে গোবরে অবস্থা হতো না। বস্তুত বুদ্ধবাবুকে পার্টির নিচের তলার অধিকাংশ লোক নাকি "খলনায়ক" বলেন? তাঁরা আরও বলেন ৩০ বছরের কাজকে বুদ্ধবাবু শেষ করে দিলেন।

এখন এটা গবেষণার বিষয় বুদ্ধ নিরুপম এমনটা করলেন কেন? কিসের প্রেরণায়? কোন সাহসে পার্টি বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় তোয়াক্কা না করে চললেন? বুদ্ধ-নিরুপমের অভ্রংলেহি মনোভাব প্রবল। পার্টির সাধারণ সভ্য সমর্থক দরদী বসে পড়া কর্মীরা কাছে ঘেঁসতে পারেন না একথাটা প্রায়ই শোনা যায়।

আর এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন বিমান বসু। পরন্তু তাঁর কিছু উক্তি ঘৃতাহুতির কাজ করেছে। বিমান বসু রাজ্য সম্পাদক হিসাবে ব্যর্থ হয়েছেন বলে নিচের তলার সদস্যরা মনে করেন। এইসব কারণে পার্টির নেতৃত্ব বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। পার্টির মধ্যে কোনও কোনও নেতা মনে করেন নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল এবং পুর নির্বাচন নিয়ে রাজ্য পার্টির প্লেনাম ডাকা উচিত এবং নীতি ও নেতৃত্ব বদল করা দরকার।

সিঙ্গুরের ধর্ণাতে দেখা গেল রোজার নামাজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলিমদের মতোন মাথায় কাপড় বেঁধে নমাজ করছেন! তিনি 'উজু' করেছিলেন কি? মুসলিমদের ধর্মে তো ভিন্নধর্মীদের নমাজে অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ বলেই জানি। আজকাল অবশ্য মুসলিমদের পিঠ চুলকাতে এ-সব করা হচ্ছে — ভোট বড়ই বিষম বস্তু।

সিপিএম-এর দৈনিকে ফটোকপি সহ এক সংবাদে প্রকাশ সিঙ্গুরে টাটাদের প্রকল্পের পাশেই সোমেন মিত্র জমি কিনেছেন। 'রিসর্ট' হবে। সোমেন মিত্র এখন মমতার সঙ্গী! রাজনৈতিক গদাধরচন্দ্ররা ডুডু এবং তামাক একই সঙ্গে খায়।

অ দে রকম

পথ শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মা-বাবাকে হারিয়ে, জীবনের শেষ সম্বলটুকু খুইয়ে একদিন স্টেশনটাই তাদের কাছে মাথা গোঁজার ঠাঁই-তে পরিণত হয়েছে। স্টেশনে ঠাঁই পেতেও তাদের কম ঝড়-ঝাপ্টা পোয়াতে হয়নি। আর এটুকুও যদি না জুটত তবে যে কোথায় হারিয়ে যেত তা কেই বা বলতে পারে। নীলু-ভুলুদের কাছে তাই স্টেশনটাই ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ — এটাই সব। তাদেরই বয়সের ছেলেরা যখন মা'র হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়, বাবার কাছে ক্যাডবেরির আবদার করে, সেখানে নীলু-ভুলুদের দিন কাটে বাবুদের বুট পালিশ করে বা জলের বোতল বিক্রি করে। কখনও ট্রেনের কামরা ঝাঁট দিয়ে।

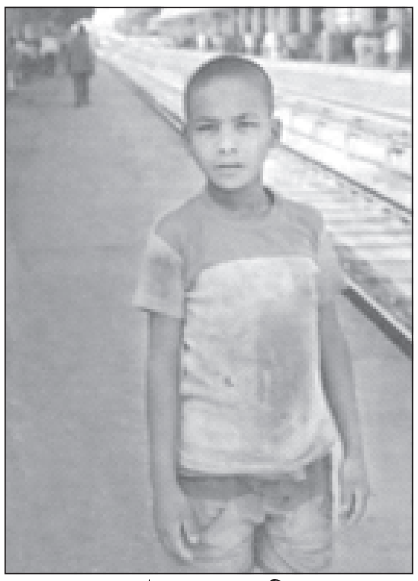

রেলস্টেশনে এক পথশিশু।

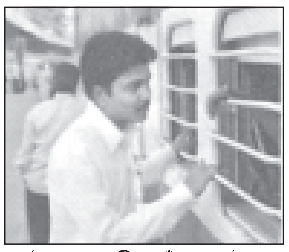

মৌনেশ পথশিশু খুঁজছেন ট্রেনে।

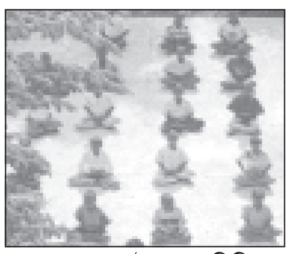

ব্যাঙ্গালোরে মৌনেশের শিবিরে যোগাভ্যাস চলছে।

কত বড় বড় মানুষ যাতায়াত করে। যখন ছোটো ছোটো বাবু সোনারা মা-ঠাকুরমার গলা ধরে আদর করে, টুইঙ্কল-টুইঙ্কল পড়ে শোনায় তখন তারা হাঁ করে সেগুলি শোনে। যখন স্যুট-টাই পরা বাবুরা হ্যালো-হাই, থ্যাঙ্ক ইউ বলে কথা বলে তখন তারা সেগুলি কান পেতে শোনে আর অবাক হয়। ভাবে, কত তাড়াতাড়ি ইংরাজিতে কথা বলছে। মাঝে মধ্যে তারা সেগুলির নকল করতে যায়। কিন্তু মুখ থেকে বের হবার আগেই তা জিভে আঁটকে যায়। তিন বছর আগের এই দৃশ্যগুলো আজও তাদের চোখে ভাসে। তারা ভাবতেই পারেনি একদিন তারা তাদের স্বপ্নের টুইঙ্কল-টুইঙ্কল লিটল স্টার পড়বে। সেগুলি অনর্গল বলে যেতে পারবে। এই সবই সম্ভব হয়েছে মৌনেশ স্যারের কৃপায়। তবে মৌনেশ স্যার তাদের দাদা বলে ডাকতে বলেছেন। ব্যাঙ্গালোরের মৌনেশ স্টেশনের অন্ধকার থেকে শত শত নীলু-ভলুকে উদ্ধার করে তাদের মুখে কেবল অন্ন নয়, পেটে বিদ্যাও দিয়েছেন। তাই তো দু-মুঠো অন্নের জন্য ঘুরে-বেড়ানো নীলু-ভলুদের আজ তাই গো-মুখ্যু হয়ে থাকতে হল না। মৌনেশবাবু পথের শিশুদের তুলে নিয়ে এসে নিজে খরচ করে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ কী মুখের কথা! রীতিমতো দেবতুল্য মনের মানুষ তিনি। একদিন যাদের মাথার ওপর ছাদ ছিল না তিনি তাদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। শৈশবের শিশুদের শৈশবে ফিরিয়ে দেওয়ার মহান ব্রত তিনি গ্রহণ করেছেন। আর এই সব করাতে তাঁকে আর্থিক সমস্যার মধ্যে যে পড়তে হয়নি তা নয়, তবুও সমাজের সহৃদয় ব্যক্তিদের সাহায্যে যাহোক করে চলে যায়। শুধু যে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা তা নয়, শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক বিকাশও যাতে হয় তার ব্যবস্থাও মৌনেশবাবু করেছেন। এর জন্য আছে নিয়মিত ধ্যানাভাস, খেলাধুলো। তাদেরকে তাদের অভিভাবকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার মতো মুখ্য কাজটুকুও তিনি সবার আড়ালে কখন যে সেরে ফেলেন তা কেউ বলতে পারে না। ব্যাঙ্গালোর স্টেশনের এমন কেউ নেই যে মৌনেশবাবুর নাম জানে না। সবাই তাঁকে 'পথ শিক্ষক' মৌনেশ বলে সম্বোধন করে। মৌনেশবাবুর মতো ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম ঠিকই, কিন্তু তাঁরা মুষ্ঠিমেয় হলেও অনুসরণযোগ্য।

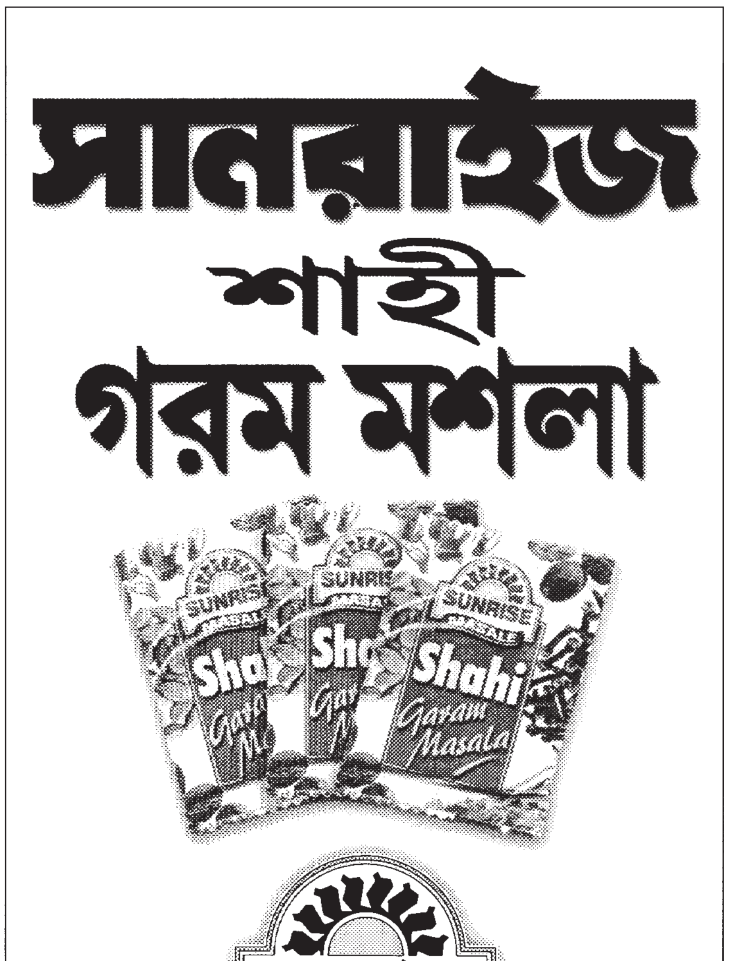

অসমের নাগরিক পঞ্জিতে নাম লেখাতে প্রয়োজনে ডি এন এ টেস্ট

অনুপ্রবেশকারীদের বয়কট করার জন্য ডিব্রুগড়ে বিজেপির মিছিল।

সংবাদদাতা ।। অসমের রাজনীতিতে বিদেশী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী বিতাড়ন আন্দোলন আবার নতুন করে দানা বাঁধছে। পথে নেমেছে পক্ষ, বিপক্ষ — দু'পক্ষই। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস এবং এ ইউ ডি এফ রাজ্যের তাবৎ সংখ্যালঘুকে বহাল তবিয়তে রাখতে মরিয়া। ওদিকে ছাত্র সংস্থা আসু, এ বি ভি পি, অসম জাতীয়তাবাদী যুবছাত্র পরিষদ, অসম পাবলিক ওয়ার্কস, বিভিন্ন লেখক, সাংবাদিক ও নাগরিক সংগঠন বিদেশী অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নে পথে নামছেন। এ সময়ে জাতীয় নাগরিক সূচী তৈরি ও তার ভিত্তিবর্ষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রয়োজনে হবে ডি এন এ টেস্টও।

জাতীয় নাগরিক পঞ্জি উন্নীতকরণের জন্য ঘরে-ঘরে গিয়ে সমীক্ষা চালানো হবে না, এটা আগেই জানা গেছে। এবার প্রকাশ্যে এসেছে 'সম্পর্ক' যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনে ডিএনএ পরীক্ষার সাহায্য নেওয়ার কথা। নাগরিক পঞ্জিতে নাম লেখানোর আবেদনকারীর সঙ্গে তাঁর সন্তান-সন্ততি বা অন্যান্যদের কী 'সম্পর্ক', তা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনে ডি এন এ পরীক্ষা করা হবে।

জাতীয় নাগরিক পঞ্জি উন্নীতকরণের 'মোডালিটি' বা পদ্ধতিতেই এর উল্লেখ রয়েছে। সারা আসাম ছাত্র সংস্থার (আসু) দাবি মেনে সরকার ডিএনএ পরীক্ষা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করেছে নাগরিক পঞ্জি উন্নীতকরণে। সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভা ওই পদ্ধতি অনুমোদন করে কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছে এবং নাগরিক পঞ্জি উন্নীতকরণের মোডালিটি বা পদ্ধতি সম্প্রতিপ্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার। তাতে বলা হয়েছে, 'পিতৃত্বের ক্ষেত্রে সন্দেহ দেখা দিলে প্রয়োজনে ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে।' নিঃসন্দেহে 'বিদেশি' খ্যাত বাংলাভাষীরাই মুখোমুখি হবেন ডিএনএ পরীক্ষার।

বাস্তবে ডিএনএ হচ্ছে—ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড। বংশ পরম্পরায় একজন ব্যক্তি বা মানব প্রজাতির যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্মে প্রবাহিত হয়, এর মূলে রয়েছে প্রাণী শরীরের 'জিন'। এই জিনই যে বংশগতির ধারক, বিজ্ঞানীরা তা বহুকাল আগেই আবিষ্কার করছেন। জিন আসলে ডিএনএ এবং আরএনএ-এর (রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) একটি যৌগ। তবে বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ডিএনএ-র উপরই নির্ভর করা হয়। শরীরের চুল, দাঁত, লালা ইত্যাদি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানসম্মতভাব ডিএনএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রমাণের ব্যবস্থা এরাজ্যে করা হচ্ছে।

নাগরিক পঞ্জি উন্নীতকরণের 'মোডালিটি' অনুযায়ী, তালিকায় নাম তুলতে হলে সাধারণ মানুষকে আরও কয়েকটি ধাপ পেরোতে হবে। ঘরে-ঘরে গিয়ে সমীক্ষা চালানোর পরিবর্তে নাগরিক নথিতে নাম লেখাতে হলে আবেদন করতে হবে নিজেদেরই। এ-জন্য ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করবে সরকার। পদ্ধতি অনুযায়ী, ঘরে-ঘরে গিয়ে সমীক্ষা চালানোর পরিবর্তে ১৯৫১ সালের নাগরিক পঞ্জি এবং ১৯৭১ সালের ভোটার তালিকার প্রতিলিপি ব্যাপক হারে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি করা হবে। প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া হবে ওই দুটি নথির প্রতিলিপি। উল্লেখ্য, ১৯৫১ সালের নাগরিক পঞ্জি এবং ১৯৭১ সালের ভোটার তালিকাকেই নাগরিক পঞ্জি উন্নীতকরণের ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়েছে। ওই দুটি তালিকার মধ্যে কোনও একটিতে যাদের নাম থাকবে তারা এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততির নামই নাগরিক পঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া উপযুক্ত নথিপত্র, ঘটনাস্থলে তাৎক্ষণিক তদন্তের পাশাপাশি ট্রাইবুনালের বিচারকেও নাগরিক পঞ্জিতে নাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

১৯৫১ সালের নাগরিক পঞ্জি এবং ১৯৭১ সালের ভোটার তালিকার মধ্যে কোনও একটিতে নাম থাকলে সেই ব্যক্তিকে নিজের এবং সন্তান-সন্ততির নাম পঞ্জিভুক্ত করতে তাদের সঙ্গে 'সম্পর্কে'র উপযুক্ত নথিপত্র সহ আবেদন করতে হবে। যদি তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বেঁচে না-থাকেন, তাহলে উপযুক্ত নথিপত্র সহ সরাসরি আবেদন করতে হবে পরিবারের কর্তাকেই। আবেদনে ১৯৫১ সালের জাতীয় নাগরিক পঞ্জিতে নির্ধারিত প্রপত্র অনুযায়ী সঠিক তথ্য দিতে হবে। ভুল তথ্য প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টিও রয়েছে নাগরিক পঞ্জি প্রস্তুতের পদ্ধতিতে।

আবেদন হাতে পাওয়ার পর খতিয়ে দেখা হবে আবেদনকারীর সঙ্গে অন্যান্যদের কী 'সম্পর্ক'। তা যাচাইয়ের পর একটি তালিকা প্রস্তুত করা হবে যেখানে ১৯৫১ সালের নাগরিক পঞ্জি কিংবা ১৯৭১ সালের ভোটার তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তারা এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের নাম ঠাঁই পাবে। আইনের বিচারে ১৯৭১ সালের পরে ভারতে আগত 'বিদেশি' ঘোষিত ব্যক্তিদের নাম ঠাঁই পাবে না সেই তালিকায়। তবে ১৯৬৬ সালের পর এবং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে আসামে এসেছেন এবং বিদেশি নাগরিক পঞ্জিতে নাম লিখিয়েছেন তাদের নাম তালিকায় থাকবে। যাদের নাম তালিকায় থাকবে না তাদের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে ঘটনাস্থলে তৎক্ষণাৎ তদন্ত করা হবে। স্থানীয় তদন্তকারী অফিসারের রিপোর্টের ভিত্তিতেই বৈধ ব্যক্তিদের নাম সন্নিবিষ্ট করা হবে তালিকায়।

এই তালিকা প্রস্তুতের পর খসড়া জাতীয় নাগরিক পঞ্জি হিসাবে তা প্রকাশিত হবে। খসড়া জাতীয় নাগরিক পঞ্জিতে যদি কারও নাম বাদ পড়ে যায় তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে। খসড়ায় নাম অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কারও বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি উঠলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নির্ধারিত প্রপত্রে আবেদন করতে হবে অভিযোগকারীকেও। অভিযোগের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পেশ করতে হবে যাবতীয় তথ্য সহ। তদন্ত করে ওই সব ওজর-আপত্তির নিষ্পত্তির পর খসড়া নাগরিক পঞ্জিতে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করা হবে। ওজর-আপত্তির নিষ্পত্তি নিয়ে কোনও আপত্তি থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদেশি ট্রাইবুনালের কাছে আবেদন করা যাবে। বিদেশি ট্রাইব্যুনালের বিচারে বৈধ্যতা প্রমাণের পরই সেই ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত হবে খসড়া নাগরিক পঞ্জিতে।

এরপরই নাগরিক পঞ্জি চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হবে। তবে কিছু কিছু জেলায় ১৯৫১ সালের নাগরিক পঞ্জি ও ১৯৭১ সালের ভোটার তালিকা আংশিকভাবে পাওয়া গেছে। ওই সব জেলায় নাগরিক পঞ্জি উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে তা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আরব থেকে আগরতলা জাল ড্রাফ্‌ট চক্র

ভারতের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সোজা বাংলাদেশে

সংবাদদাতা ।। আরব থেকে আগরতলা। আসছে জাল ড্রাফ্‌ট। জমা হচ্ছে আগরতলার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে। তারপর ভাঙিয়ে হাতবদল হয়ে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে জেহাদিদের কাছে। সম্প্রতি এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আরব থেকে আগরতলা ড্রাফ্‌ট জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়ল। ২০০৬ সালে প্রথম ধরা পড়েছিল। তারপর আবার চলতি বছরের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে সি বি আই তদন্ত চলাকালীনই দশ-বারো দিনের মধ্যে তিনটি জাল ড্রাফ্‌ট্ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের আগরতলা শাখায় জমা পড়েছে। তবে এবার ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সজাগ থাকায় টাকা তোলা যায়নি। কিন্তু ইতিমধ্যে ওই ব্যাঙ্ক থেকেই এককোটি আশি লক্ষ টাকা বাঁকা পথে বেরিয়ে গেছে।

সংবাদসূত্র অনুযায়ী এবার ড্রাফটগুলো জমা পড়েছে কৈলাশহর ইউ বি আই এবং টিলাবাজার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। তৃতীয় ড্রাফ্‌টটি এসেছে সোনামুড়া গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে। ২০০৬ সালে প্রথমবার ধরা পড়ার পর বিগত দু'বছরে তদন্তের কাজ যে এগোয়নি এবারের ঘটনায় সেটা প্রমাণিত। ভারতীয় ও বাংলাদেশী দুস্কৃতীরা যৌথভাবেই এই জাল ড্রাফটের কারবার চালাচ্ছে বলে জানা গেছে। সোনামুড়া ত্রিপুরার বাংলাদেশ লাগোয়া সীমান্ত এলাকা। সীমান্ত প্রহরীদের এড়িয়ে এপার ওপার করাটা জলভাত। আবার তারা যদি মুসলমান হয় তো সুবিধা ষোল আনা। সীমান্তে বসবাসকারী বেশ কিছু লোক আছে যাদের দু'দেশেই ঘরবাড়ি, রেশনকার্ড, ভোটার তালিকায় নাম থেকে শুরু করে জরু-গরুও রয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকার জনচরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লোকেরা এসব কথাই জানেন।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের আগরতলা শাখার তরফে জাল ড্রাফ্‌টগুলি পুলিশের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগরতলা পশ্চিম থানা জানিয়েছে তারা ওই ভ্যানে ড্রাফট্‌গুলি কৈলাশহর থানাকে দিয়েছে। কৈলাশহর থানা সূত্রে জানা গেছে, দু'টি ড্রাফ্‌টের একটি জনৈক আমবার আলির নামে। তার বাড়ির কোনও ঠিকানা দেওয়া নেই। ব্যাঙ্ক একাউন্ট গ্রামীণ ব্যাঙ্ক টিলাবাজার শাখার। ব্যাংকের একাউন্ট নম্বর ২০৭৮, টাকার পরিমাণ চল্লিশ হাজার। অন্য ড্রাফ্‌ট যা কৈলাশহর থানার হাতে তার প্রাপক জনৈক কুসুম আলি। ব্যাঙ্কের ইউ বি আই, কৈলাশহর শাখা। ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর ২১৩৫ এবং পরিমাণ ৩০ হাজার ৫০০ টাকা। দুটি ড্রাফ্‌টই সৌদি আরবের আলরাজি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন থেকে গত ১ জুলাই, ২০০৮ ইস্যু করা হয়েছিল। ড্রাফ্‌টের গায়ে লেখা রয়েছে আলরাজি ব্যাঙ্ক 'ডেবিট টু আওয়ার একাউন্ট নং-৩৭১৭৭, উইথ ইয়োর ইন্টারন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ বসট্রো'। দুটি ড্রাফ্‌টের ইস্যুর তারিখ এক। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের আগরতলা শাখা থেকে পশ্চিম আগরতলা থানায় যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে দুটি ড্রাফ্‌টই জাল। হলোগ্রাম নেই। কাগজের মানও সন্দেহজনক। ড্রাফ্‌টের পিছনে যে স্পেশিমেন সিগনেচার তাও নকল। ২০০৬ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের আগরতলা শাখা থেকে যে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছিল সেই ড্রাফ্‌টগুলিও এরকমই ছিল। তাহলে এখন একই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কীভাবে সেই ড্রাফ্‌ট পাশ করে দিয়েছিলেন তা নিয়েই তদন্ত চলছে। রাজ্য পুলিশের তদন্তে নেমে মনে হয়েছে, সোনামুড়াও বাংলাদেশের একাধিক অপরাধী এই জালিয়াতিতে যুক্ত। তাঁরাই সি বি আই-এর সাহায্য চান। তখন রাজ্য সরকার তদন্ত সি বি আইকে হস্তান্তর করে দেয়। রাজ্য পুলিশের তদন্তকারী অফিসার স্বপন দাসগুপ্ত মামলার যাবতীয় তথ্য গত জুন মাসেই কলকাতায় গিয়ে সি বি আই-কে দিয়ে আসেন। কিন্তু দু'মাসের বেশি সময় পার হলেও সি বি আই তদন্তের জন্য ত্রিপুরার মাটি স্পর্শ করেনি। এতেই জালিয়াতি চক্র উৎসাহিত ও সক্রিয় হয়ে একই কারবার আবার শুরু করে দেয় বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। সুতরাং এখনও অবধি অভিযুক্তরা কেউ যে ধরা পড়েনি। আগের বার যে ৫৯ জন অভিযুক্তের মাধ্যমে জাল ড্রাফ্‌ট ভাঙিয়ে টাকা তোলা হয়েছিল পুলিশ তাদের অনেককেই গ্রেপ্তার করেছিল।

অনেকেই আবার নিজে থেকে আদালতে আত্মসমর্পণ করেছিল। যদিও মূল পাণ্ডাদের চুলও পুলিশ স্পর্শ করতে পারেনি। এবারও যে আগের ঘটনার ব্যতিক্রম হবে না তা হলফ্ করে বলা যাচ্ছে না। ২০০৬ সালে জালিয়াতির দু'কোটি আশি লক্ষ টাকার এক পয়সাও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের আগরতলা শাখা উদ্ধার করতে পারেনি। তবে বোঝা যাচ্ছে জালিয়াতি চক্রের জাল বহুদূর বিস্তৃত, তাদের হাতও অনেক লম্বা। বিশেষ করে হুজি জঙ্গি যে রাজ্যে মন্ত্রীর আশ্রয়ে থাকে সেখানে এসব ঘটনা জলভাত বলেই অনুমান।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

ফের জাতপাতের রাজনীতি টেনে আনছে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। লোকসভার নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে উত্তরপ্রদেশে রাজনীতির তাওয়া তত গরম হচ্ছে। কারণ লোকসভার মোট ৫৪৪ আসনের মধ্যে এখানেই আছে ৮০টা। রাজ্যে প্রধান তিন দল বহুজন সমাজ পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সমাজবাদী পার্টি ইতিমধ্যেই অস্ত্র শানাতে শুরু করেছে। মুলায়ম ধরেছেন রাজ্যে তলিয়ে যাওয়া কংগ্রেসের নৌকো। মায়াবতী এখনও কোন দিকে যাবেন — বি জে পি না তথাকথিত তৃতীয় ফ্রন্ট, তা নিয়ে খোলসা করছেন না, এখনও ঝুলিয়ে রেখে মায়াজালের ধোঁয়াসা সৃষ্টি করে যাচ্ছেন।

বি জে পি'র স্ট্যাণ্ডই সবচাইতে পরিষ্কার। মায়াবতীর সঙ্গে জোট হলে ভাল। নাহলে মুখ্যত একলা চলো।

এখন সবচাইতে বিপাকে পড়ে গেছে কংগ্রেস। কখনও মুসলিম ভোট বাগাতে সংখ্যালঘু তোষণের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে, কখনও হাতছাড়া হওয়া তথাকথিত উচ্চ বর্ণের লোকেদের ভোট কব্জা করতে মাঠে নেমে কসরত করছে। প্রয়াত রাজীব গান্ধীর আমলে রামজন্মভূমি মন্দির নিয়ে দুমুখো নীতির ফলে কংগ্রেস হিন্দু এবং মুসলমান উভয় ভোটই খুইয়ে বসে আছে। সেই আম এবং ছালা দুটোর কোনওটাই এখনও ফিরে আসেনি। এবারও তার সম্ভাবনা নেই দেখে সুযোগ বুঝে দর হাঁকছেন মুলায়ম সিং। আসন ভাগাভাগিতে মুলায়ম বিড়াল হয়ে পিঠে ভাগ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

মুলায়ম বেশি আসনে লড়লে কংগ্রেস যে আরও বেশি কোণঠাসা হয়ে পড়বে এটা ওই রাজ্যে দলের পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত দিগ্বিজয় সিং কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাহুল গান্ধীকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। মুলায়ম টেনে নিয়ে যাবেন মুখ্যত মুসলিম এবং দলিত ভোটের একাংশ। তাহলে কংগ্রেসকে সম্মানজনক অবস্থানে থাকতে হলেও টানতে হবে ব্রাহ্মণ তথা উচ্চবর্ণের ভোট। যেটা এক সময় কংগ্রেসের সব চাইতে বড় ভরসা ছিল। কমলাপতি ত্রিপাঠী, নারায়ণ দত্ত তিওয়ারি প্রমুখ ছিলেন তখন সামনের সারিতে। তারপর মুসলিম ভোট টানতে রাজ্যে কংগ্রেস সভাপতি করা হয়েছিল গুলাম নবি আজাদ, সলমন খুরশীদকে। কিন্তু তাতে মুসলমানদের মন ভেজানো যায়নি।

এদিকে বিজেপি এবং এমনকী বি এস পি-ও বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু এবং ক্ষেত্র বিশেষে মুসলিম ভোট টেনে নিচ্ছে। ফলে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের রাজনীতিতে পোক্ত কংগ্রেসের ভাঁড়ার এসে ঠেকেছে প্রায় শূন্যের কোটায়। রায়বেরেলি এবং আমেথি ছাড়া কংগ্রেসের 'নিশ্চিত' আসন বলতে কিছু নেই। এই অবস্থায় কংগ্রেস আবার ভোল বদলের রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে। ঝাঁপিয়ে পড়েছে ব্রাহ্মণ তথা উচ্চ বর্ণের লোকেদের সমর্থন আদায় করতে। আর এটা করতে গিয়ে হঠাৎ করেই কংগ্রেস নেতাদের মনে পড়ে গেছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও পরে রেলমন্ত্রী প্রয়াত কমলাপতি ত্রিপাঠীর কথা। এক-আধ দিন নয়। মৃত্যুর দীর্ঘ ১৮ বছর পরে প্রয়াত কমলাপতি কংগ্রেসের কাছে এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। এ আই সি সি ঠিক করেছে কমলাপতি ত্রিপাঠীর ১০৩ তম জন্মবার্ষিকীতে রীতিমতো ঘটা করে অনুষ্ঠান পালন করা হবে।

দিগ্বিজয় সিং

কারও জন্মশতবর্ষ ধুমধাম করে পালিত হলে তেমন কথা ওঠে না। কিন্তু ১০৩ বছর পালনটা যে নিছক ভোটের রাজনীতি এটা বুঝতে কারও অসুবিধা হবার কথা নয়। ঠিক হয়েছে ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন সোনিয়া গান্ধী এবং বিশেষ অতিথি হবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং। অথচ তিন বছর আগে লক্ষ্ণৌ এবং বারাণসীতে যখন প্রয়াত ত্রিপাঠীর জন্মশতবর্ষ পালিত হয়েছিল তখন এই দুই নেতা কিন্তু কোনওরকম আগ্রহ দেখাননি। এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা 'অতীত নিয়ে আমরা ঘাটাঘাটি করতে চাই না' বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন।

কংগ্রেস যে উত্তরপ্রদেশে ফের জাতপাতের রাজনীতি তুঙ্গে তুলেছে তার ইঙ্গিত কিছুদিন ধরেই পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিংকে তো রাজ্যের দায়িত্ব দেওয়াই হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য কংগ্রেসের সাপতি করা হয়েছে প্রয়াত হেমবতীনন্দন বহুগুণার মেয়ে রীতা বহুগুণা যোশীকে। রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় নেতা করা হয়েছে প্রমোদ তিওয়ারীকে। সেই সঙ্গেই চলছে যথারীতি মুসলিম তুষ্টিকরণও। অর্থাৎ সেই দু'নৌকোয় পা রেখে চলছে কংগ্রেস। ফলে এবারও তাদের পা ফসকে জলে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

জাতীয় ইস্যুকে তুলে ধরে সভাপতি পদে জয়ী বিদ্যার্থী পরিষদের নপূর শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সভাপতি পদে জয় লাভ করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। বিশ্ব বিদ্যালয়ের

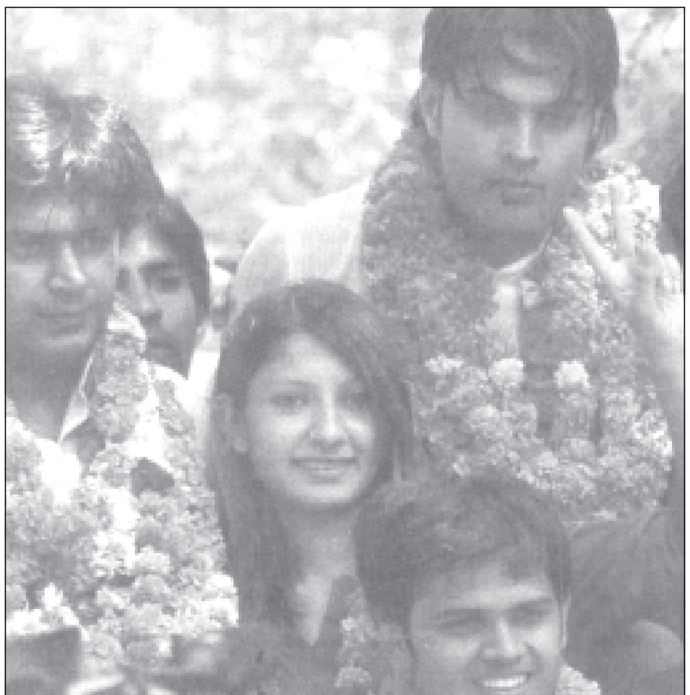
নির্বাচনে জিতে বিদ্যার্থী পরিষদের নেতানেত্রীদের জয়োল্লাস।

নীতি নির্ধারণের এই পদে বিদ্যার্থী পরিষদের প্রার্থী নপুর শর্মা বিশাল অঙ্কের ব্যবধানে জয় লাভ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদ হচ্ছে সভাপতির পদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সমস্ত কাজকর্ম সভাপতিকে সামনে রেখেই পরিচালিত হয়। এবছরের নির্বাচনে বিদ্যার্থী পরিষদ কংগ্রেস ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই কে হারিয়ে পদটি তাদের দখলে রেখেছে। পরিষদ তাদের এই জয়কে জাতীয় শক্তির জয় বলে ঘোষণা করেছে। শ্রীমতি শর্মা ১০ হাজারেরও বেশি ভোট পেয়েছেন। নপুর শর্মার এই জয়ে স্বাভাবিক ভাবেই এখন খুশির হাওয়া বইছে পরিষদের শিবিরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সংসদ সভাপতি নকুল ভরদ্বাজের মতে সভাপতি পদটি বিশ্ব বিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারক পদ। আমরা এই পদের যথাযথ গুরুত্ব বজায় রাখব। তাঁর মতে নপুরের মেধা এবং সেইসঙ্গে তার অভিজ্ঞতাই তাকে জয়ী করেছে।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ দখলের ওপর দিল্লী প্রদেশে সরকার গড়া না গড়া নির্ভর করে, এরকম ধারণা অনেকেরই। কেবল ধারণা নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবেও তা দেখতে পাওয়া গেছে। যখন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ জিতেছে তখন ক্ষমতায় আসতে দেখা গেছে বিজেপি-কে। যদিও বিদ্যার্থী পরিষদ সম্পূর্ণতঃই একটি ছাত্র সংগঠন, কোনও রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠন নয়। অনুরূপভাবে যখন ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া নির্বাচনে জিতেছে তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষমতায় বসেছে কংগ্রেস। যদিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সি পি এম সহ কমিউনিস্টদের বেশ ভাল প্রভাব প্রতিপত্তি আছে কিন্তু রাজনৈতিক নির্বাচনের সময় দেখা যায় কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের লেজুড় হয়ে কাজ করছে।

লক্ষ্য করার বিষয় হল, কংগ্রেসী ছাত্র ইউনিয়ন তার নির্বাচনী ইস্তাহারে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার চাইতে রাজনীতির দিকটাকে অনেকটাই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এসেছে 'সেকুলারইজম'-এর নামে সংখ্যালঘু ও তুষ্টিকরণের ফর্মুলাও। অথচ জাতীয় স্বার্থের বিষয়গুলো কার্যত উপেক্ষিতই থেকে গেছে। এটা কোনও ছাত্র ইউনিয়নের না রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহার তার পার্থক্য করা কঠিন। অন্যদিকে বিদ্যার্থী পরিষদের ইস্তাহারে স্থানীয় এবং জাতীয়, উভয় বিষয়গুলোও প্রায় সমান গুরুত্ব পেয়েছে। বিদ্যার্থী পরিষদের দাবিগুলোর মধ্যে আছে ছাত্রছাত্রীদের আউস্টেশনের সুবিধা, যাতায়াতের সুবিধা তথা স্টুডেন্টস কনসেশন, মেধাবী বিদ্যার্থীদের জন্য ছাত্রবৃত্তির হার বৃদ্ধি করা, কলেজ স্তরে ছাত্রবীমা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ, ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি এমনকী অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের জন্য প্রস্তাবিত জমি'র দাবি সহ জাতীয় বিষয়গুলোও ইস্তাহারে স্থান পেয়েছে। পরিষদের পক্ষে সভাপতি পদপ্রার্থী নপুর শর্মা বলেছেন ছাত্রছাত্রীরা জাতির ভবিষ্যৎ। তাই জাতীয় স্বার্থের কথাও তাদের ভাবতে হবে। তবে তিনি অবশ্য ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব সমস্যাগুলোর ওপর জোর দিয়েছেন বেশি করে। বিশেষ করে হোস্টেলের ব্যাপারে।

জম্বু সাভারীর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মহীশূরে বিজয়া দশমী বা দশেরা উৎসবে সুসজ্জিত হাতির দলের পথপ্রদর্শনী জগৎবিখ্যাত। যদিও এটা বিজয়া দশমীতে হয়ে থাকে কিন্তু তার প্রস্তুতি, বিশেষ করে হাতিদের প্রশিক্ষণ চলে অন্তত একমাস ধরে। পথে তার সমবেতভাবে শুঁড় তুলে অভিবাদন জানানো কিম্বা পা তুলে মনোরঞ্জন করার ব্যাপারে যাতে কোনও ভুলচুক না করে সেজন্য মহীশূরে এখন থেকেই তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যেই ৬টি বিশালকার হাতি মহীশূরে নিয়ে এসেছে সেখানকার দেবস্বম বোর্ড। মহীশূর প্যালেস গ্রাউণ্ডে 'জম্বু সভারী' বা সুসজ্জিত হাতিগুলোর প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রতিদিন তাদের মহীশূর প্যালেস গ্রাউণ্ড থেকে বান্নিমানতাপ পর্যন্ত হাটানো হচ্ছে। এই পথের দৈর্ঘ্য। হল ৫ কিলোমিটার। প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে জানা গেছে হাতিগুলোর নাম হল বলরাম, অর্জুন,গজেন্দ্র, অভিমন্যু, সরলা এবং বিজয়। প্রদর্শনীর সময় বলরাম ৭৫০ কেজি ওজনের সোনার হাওদা বয়ে নিয়ে যায়।

মহীশূরে দীর্ঘদিন ধরেই বিজয়া দশমী বা দশেরাতে প্রথাগতভাবে এই প্রদর্শনী চলে আসছে। এটা দেখাবার জন্য সারা ভারত তো বটেই বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ ওই সময় ছুটে আসেন। রাবণকে বধ করে রামচন্দ্রের বিজয় লাভের দিনটিকে দক্ষিণ ভারতের মহীশূরে আজও এইভাবে পালিত হয়ে থাকে। হস্তী প্রদর্শনী না বলে এটাকে তাই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির বিজয় মিছিল বলা যেতে পারে।

অসম-এর অনুন্নয়নে কেন্দ্র ক্ষুব্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অসমের গ্রাম উন্নয়ন বাবদ বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করতে না পারায় কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক বেশ ক্ষুব্ধ। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন স্বয়ং দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও আর জে ডি দলের সাংসদ রঘুবংশপ্রসাদ সিং। তিনি বলেছেন, গ্রামোন্নয়নে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অসম পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষত গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন বা শৌচাগার নির্মাণের কাজে অসম বেশ পিছিয়ে রয়েছে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন-(০৩৪৬৩) ৫৬২২২

ধ্বংসের মুখে হাওড়ার শিল্পাঞ্চল

বিশেষ সংবাদদাতা ।। একসময় হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছোট ও মাঝারি মাপের ঢালাই কারখানা, রোলিং মেশিন, লেদ মেশিনের শব্দে কানপাতা দায় হত। আজ নানা কারণে সেই মহিমা অস্তমিত। হাওড়ার দাশনগর, বালটিকুরি, কদমতলা, বেলিলিয়াস রোড, নটবর লালরোড, বেনারস রোড, বেলগাছিয়া, শালকিয়া, ঘুসুড়িতে একসময় বহু শ্রমিক ভিড় করতেন কারখানার টানে, রোজগারের ধান্দায়। আজ সে রামও নেই অযোধ্যাও নেই। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আজ চলছে শিল্পায়নের প্রচার অথচ হাওড়ার এই অঞ্চলের শিল্প শ্মশানে পরিণত হয়েছে। এদিকে তাকাবার কোনও লোক নেই। বেনারস রোড এবং তার সংলগ্ন প্রায় বারোশো শিল্পের মধ্যে অনেকগুলিই আজ বন্ধ। এই অঞ্চলে এক সময় ১২টা স্লিপার শিল্প ছিল। সেখানে প্রায় এক হাজার লোকের কর্মসংস্থান হত। এখান থেকেই এক সময় রেলের বেশিরভাগ স্লিপার তৈরি হত। আজ সেই শিল্পগুলি বন্ধ কারণ, প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়ার ফলে লোহার চাহিদা কমেছে। ফলে ঢালাই ঘরগুলোরও অর্ডার নেই। ১৩টি রেলিং মিলের মধ্যে ১১টা বন্ধ। লেদ মেশিনের কারবারে আর নতুন প্রজন্মের উৎসাহ নেই। আগে ১ কেজি লোহার কাজে মজুরী ছিল ৮ টাকা, এখন হয়েছে ৩ টাকা। ফলে এই কাজে আর লাভ হয় না। উলুবেড়িয়া, বাউরিয়া, চেঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে জুট মিলের রমরমা ছিল একসময় আজ তা গল্প কথা। ফুলেশ্বরে শ্রমিক নেতা প্রফুল্ল চক্রবর্তী শ্রমিকদের নিয়ে সমবায় গঠন করেও কারখানা বন্ধ হওয়া রুখতে পারেননি। সরকারও চায় জুট মিলগুলো বন্ধ হয়ে থাক।

৮৯ থেকে বন্ধ হাওড়ার অধিকাংশ ময়দা মিল। বহু বছরের পুরনো হাওড়ার এই ময়দা মিলগুলি শুরুর দিকে খুব ভালোই চলত। হাওড়া ফ্লাওয়ার মিল, গঙ্গা ফ্লাওয়ার মিল, শ্রীকৃষ্ণ ফ্লাওয়ার মিল রিফর্ম ফ্লাওয়ার মিল, হুগলী ফ্লাওয়ার মিল, প্রতিটিতে গড়ে প্রায় আড়াইশো শ্রমিক কাজ করতেন। এই বড় মিলগুলিতে মাসে ১০ হাজার মেট্রিক টন ময়দা এবং ময়দাজাত অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদিত হত। কিন্তু মালিকদের অতিরিক্ত লোভের ফলে এবং সরকারের অসহযোগিতায় ময়দাকলগুলি আজ বন্ধ। স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে হাওড়ায় ৩৭টি সিনেমা হল রয়েছে। তার মধ্যে ১৫টি সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গেছে।

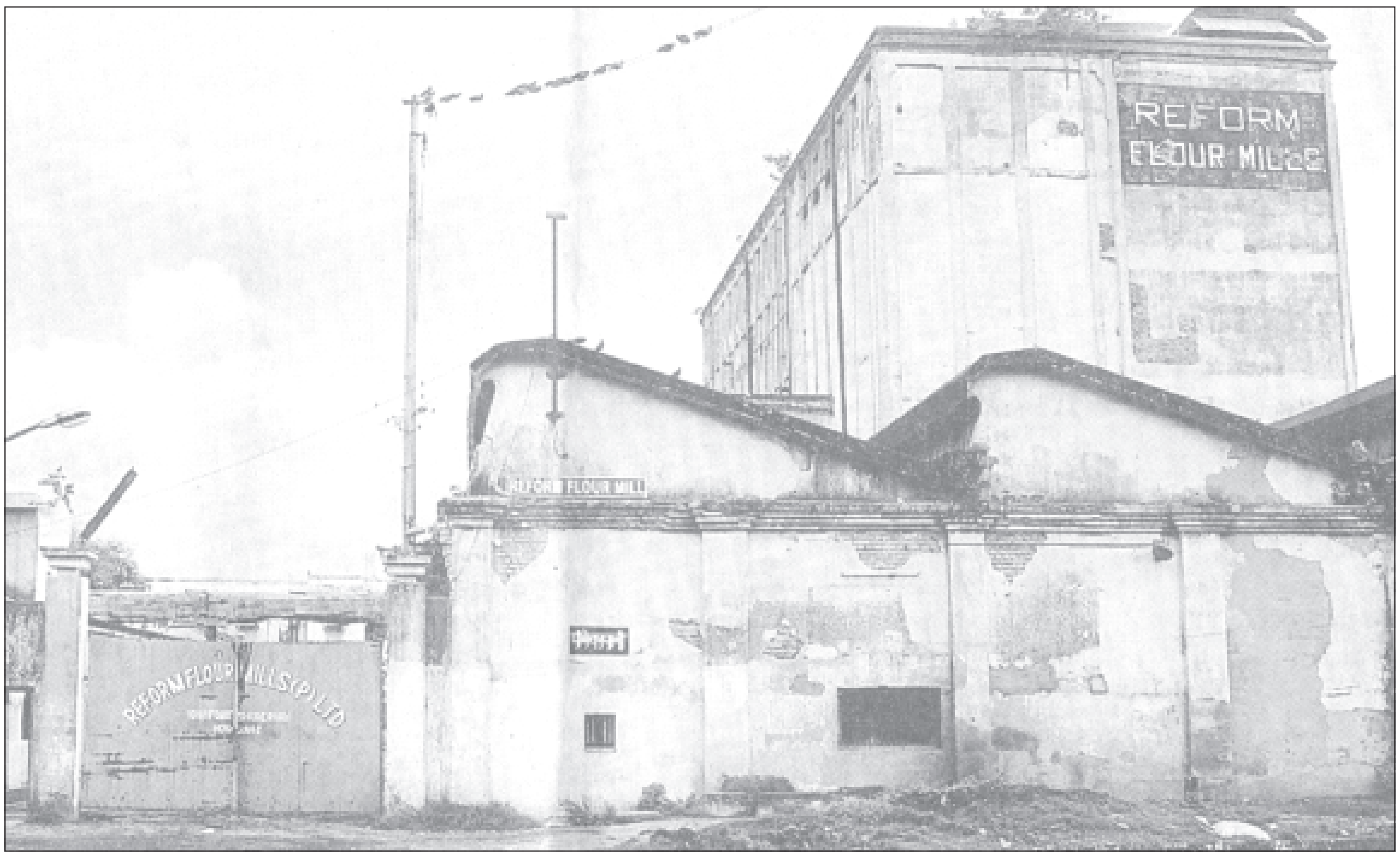

বন্ধ হাওড়ার রিফম ময়দার কারখানা।

ব্যারাকপুরের মৃত শিল্পাঞ্চল নিয়ে আগ্রহী নন সরকারও

নবকুমার ভট্টাচার্য

উত্তর ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল। বরাহনগর কামারহাটি থেকে শুরু করে কাঁচরাপাড়া পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। রয়েছে কাঁচরাপাড়া রেল কারখানা থেকে আরম্ভ করে টায়ার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, এক্সাইড ব্যাটারি কারখানা ছাড়াও ছোট বড় মাঝারি মাপের বহু কলকারখানা এবং গঙ্গার পাড় ঘেঁষে থাকা ২৫টি চটকল। এই চটকলগুলিকে নিয়ে রাজ্য সরকার আজ বিব্রত। কারণ ব্যারকপুরের মধ্যে থাকা বরাহনগর জুট মিলের ম্যানেজারকে পুড়িয়ে মারা এবং শ্রমিক হত্যার ঘটনা ঘটে গিয়েছে। বহু জুট মিল বন্ধের ফলে হাজার হাজার শ্রমিকের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ২০০২ সালে ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর সি আই টি ইউ অনুমোদিত বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের ৫৮ তম বার্ষিক সম্মেলন হয়েছিল ভাটপাড়ার প্রেমচাঁদ শতবার্ষিকী হলে। সেখানে তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন — 'আমাদের সংগঠনের দুর্বলতার কারণে শ্রমিকদের একাংশের মধ্যে এক মারাত্মক নৈরাজ্যবাদী ঝোঁক গড়ে উঠেছে। এরা চটকলের সমস্যা ও সংকটের জন্য মালিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিক্ষোভ সৃষ্টি না করে সব কিছুর জন্য ইউনিয়নকে দায়ী করছে।' এতো গেল ইউনিয়নের রিপোর্টের কিছু অংশের উদ্ধৃতি। চটকল মালিকরা কাঁচামালের অভাব ও শ্রমিকদের মধ্যে ওয়ার্ক কালচারের অভাব দেখিয়ে বন্ধ করে দিতে চায় চটকলগুলি। বেলঘরিয়ার অন্যতম বড় কাপড়ের কল মোহিনী মিল বহুকাল আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের ঢাকা এবং পশ্চিমবঙ্গের বেলঘরিয়ায় এই মোহিনী মিল তৈরি হয়। ঢাকায় এই মিল চললেও শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে বিতন্ডা এবং অযোগ্য ম্যানেজমেন্টের জন্য এই কাপড় কলটি বন্ধ হয়ে যায়। সোদপুরের হ্যারিকেন ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে শ্যামনগরের পিন ফ্যাক্টরি। ব্যারাকপুরের মৃত শিল্পাঞ্চল নিয়ে সরকার নিশ্চুপ। অথচ হাওয়ায় ভাসছে স্লোগান — শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। শিল্প বিরোধীরা নিপাত যাক। কিন্তু শিল্পটা যে কী বস্তু খায় না মাথায় মাখে, বোঝে না বন্ধ কারখানার শ্রমিকের রুগ্ন স্ত্রী। অভাবের জ্বালায় স্বামী আত্মহত্যা করেছে। ছেলেটা আজ অন্ধ কানাগলিতে মাস্‌লম্যানের সহচর। মেয়েটা মুখে রং লাগিয়ে বরাহনগরের রাস্তায় দাঁড়ায়। অথচ এই তো সেদিনও বি টি রোডের দুপাশে সারি সারি কারখানাগুলো আকাশে ধোঁয়া ওড়াতো। আর আজ বিদেশি শিল্পপতি ধরার জন্য নেতারা এবেলা-ওবেলা বিদেশ দৌড়োচ্ছেন। আজ যাদের প্রশস্তি করছেন, বন্দনা গাইছেন আড়াই দশক আগে তাদের 'কালো হাত' রোজ দুবেলা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতেন। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের কারখানাগুলো আজ অনেক বন্ধ। হয় না না বিশ্বকর্মা পুজো। সেখানে একে একে গড়ে উঠছে বহুতল আবাসন, শপিং মল, পার্কিং স্পেস। কেবল উত্তর ২৪ পরগণা জেলাতেই বন্ধ কারখানার জমির পরিমাণ ৫৪৩৫ বিঘা। আর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ফলতা শিল্পাঞ্চলের জন্য ১০০ একর জমি এখনও পড়ে রয়েছে। অথচ ১৯৮২ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আমলে ফলতা শিল্পাঞ্চলের জন্য কয়েক হাজার একর জমি চাষিদের থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।

ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল বন্ধ কারখানার অব্যবহৃত জমির পরিমাণ ঃ—১। পলতা আনমোল — ১০০ বিঘা, ২। টিটাগড় জুটমিল — ১০০ বিঘা, ৩। হিন্দওয়ার লিমিটেড, খড়দা — ২৫ বিঘা, ৪। ক্যালকাটা সিল্ক মিল খড়দা — ৫০ বিঘা, ৫। হিন্দুস্থান ওয়ার লিমিটেড পানিহাটি — ৪০ বিঘা, ৬। কমো পোলাইট, পানিহাটি — ১০ বিঘা, ৭। ইনবেরি মেশিনারিস — ১০ বিঘা, ৮। এপি এল রঙকল — ২৫ বিঘা, ৯। টেক্সম্যাকো পানিহাটি ওয়াকর্স — ৩০ বিঘা, ১০। কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং পানিহাটি — ২০ বিঘা, ১১। সোদপুর পটারিজ — ২৫ বিঘা, ১২। বাসন্তী কটন মিল, সোদপুর — ৪০ বিঘা, ১৩। বেণী ইঞ্জিনিয়ারিং, কামারহাটি — ৫০, ১৪। রমনলাল ইন্ডাস্ট্রিজ, কামারহাটি — ৩০, ১৫। শেখর আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল, কামারহাটি — ২০ বিঘা, ১৬। মোহিনী কটন মিল, কামারহাটি — ১০০ বিঘা, ১৭। ওরিয়েন্টাল কটন মিল, কামারহাটি — ১৫ বিঘা, ১৮। হিন্দুস্থান সেফটি গ্লাস, বেলঘরিয়া — ৫০ বিঘা ১৯। আই আই সি বনহুগলি — ১৫০ বিঘা, ২০। কমলা ইঞ্জিনিয়ারিং বরাহনগর — ৩০ বিঘা, ২১। বিরাটি টেক্সটাইল, দমদম — ১০০ বিঘা, ২২। এইচ এম ভি দমদম (অব্যবহৃত) — ২৫ বিঘা, ২৩। জেসপ, দমদম (অব্যবহৃত) — ১০০ বিঘা, ২৪। বেঙ্গল আনমোল, নোয়াপাড়া — ৩০০ বিঘা, ২৫। মহালক্ষ্মী কটন, নোয়াপাড়া — ৪০০ বিঘা, ২৬। ডানবার কটন মিল জগদ্দল — ১৫০ বিঘা, ২৭। অন্নপূর্ণা মিল, জগদ্দল — ৬১০ বিঘা, ২৮। টিটাগড় কপার মিল (২) ভাটপাড়া — ৫৫০ বিঘা, ২৯। উল্কা মম, ভাটপাড়া — ৩৫০ বিঘা, ৩০। হিন্দুস্থান লিভার — ১৩২ বিঘা, ৩১। ইন্ডিয়ান পেপার মাম্প, বীজপুর—৩৫০ বিঘা, ৩২। ক্যান্টনমেন্ট অ্যাণ্ড ক্রেসার- ৪৩৫ বিঘা, ৩৩। গৌরীপুর জুটমিল- ৭৫০ বিঘা, ৩৪। জনসন অ্যান্ড নিকলসন — ২৬০ বিঘা।

নেত্রদান মহাদান

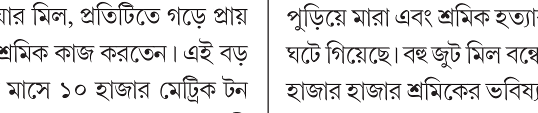

EYE BANK

23218327, 23592931, 22413853
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

বিশেষ ঘোষণা

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব 'দুর্গাপূজা' উপলক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী ও হিন্দুচেতনা জাগ্রতকারী বইয়ের স্টল করতে শীঘ্র যোগাযোগ করুন।

সদ্য প্রকাশিত
বাঙালীর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ
মূল্য-৫০ (বোর্ড বাধাই), সাধারণ - ৪০ টাকা

নিয়মাবলী
◆ ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে। ◆ টাকা জমা দিয়েই বই নিতে হবে ◆ অবিক্রিত বই ফেরত নেওয়া হবে ◆ বেশি পরিমাণ বইয়ের ক্ষেত্রে আলোচনা সাপেক্ষে আকর্ষণীয় কমিশনের ব্যবস্থা আছে

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ৬, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
✆ ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫

শিল্পায়ণের ঢেউয়ে শ্মশানে পরিণত হুগলীর শিল্পাঞ্চল

অভিজিৎ রায়চৌধুরী

বিগত ২ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের এক নব উদ্যোগ পর্ব শুরু হয়েছে। এর মধ্যে সিঙ্গুরে টাটার ছোট মোটর গাড়ি তৈরির কারখানা বোধ হয় সর্বাধিক প্রচারিত প্রকল্প। যেহেতু সিঙ্গুর হুগলী জেলায় অবস্থিত তাই হুগলী জেলার কলকারখানাগুলোর হাল-হকিকতের দিকে একবার চোখ বোলানো যেতে পারে।

বাংলায় যন্ত্রশিল্পের প্রথম যুগেই ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরবর্তী এই জেলায় শিল্পস্থাপন শুরু হয় এবং একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই জেলার বিশাল এলাকায় প্রধানত গঙ্গা তীরবর্তী এবং রেলপথ সংলগ্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার শিল্প স্থাপিত হয়। সাধারণভাবে বলা যায় বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শিল্পবন্ধু জেলা হিসাবে হুগলী জেলা পরিচিতি অর্জন করে।

এই জেলায় শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাটশিল্প। ভারতের প্রথম পাটকল (Jute Mill) ১৮৫৩ সালে রিসড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে জেলায় ১০টি পাটকল চলছে। প্রত্যেকটির অবস্থা মূমূর্ষু। বছরে অর্ধেক সময় বন্ধ থাকে। শ্রমিক কর্মচারীদের দুর্দশার শেষ নেই। অনিশ্চয়তা গ্রাস করেছে তাদের পরিবারগুলিকে। বিপুল পরিমাণ জমি এই পাটকলগুলির আছে। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে এই বিশাল সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। কোথাও কোথাও দখল হয়ে গেছে।

রিসড়া এই জেলায় অন্যতম শিল্প সমৃদ্ধ পৌর এলাকা। আজ থেকে মাত্র ১৫-১৬ বছর আগেও এখানের মানুষের ঘুম ভাঙতো কারখানা ভোঁ (সাইরেনের আওয়াজ) শুনে। উল্লেখযোগ্য কারখানা গুলির মধ্যে রামপুরিয়া কটন মিল, হুগলী কটন, জে কে স্টীল, বঙ্গেশ্বরী কটন মিল। সারের কারখানা ফসফেট কোং, ইউনাইটেড ভেজি টেবিল, শ্রীরাম সিল্ক, কুসুম, জয়শ্রী টেক্সটাইলস্, হিন্দুস্থান গ্লাস, শ্রী ইঞ্জিনীয়ারীং ইত্যাদি বেশ কয়েকটি বন্ধ হয়ে গেছে। আই সি আই'র মতো বহুজাতিক কোং'র অবস্থাও মৃতপ্রায়। এদের মধ্যে কয়েকটি টিমটিম করে কোনও মতে নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। কেউ কেউ নিজেদের কারখানার জমি অন্য শিল্প উদ্যোগীকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। যেমন, জয়শ্রী টেক্সটাইলস্, আই সি আই ইত্যাদি। দীর্ঘদিন ধরে চলা শ্রমিক বিক্ষোভের কারণে ১৯৮৭ সালের ১৫ আগস্ট জে কে স্টীল বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী কালে এটি রিসড়া স্টীল নামে শুরু হয়। কিন্তু ১৯৯৮-এ আবার বন্ধ হয়ে যায়। গত ২০০৩ সালে কারখানার মূল্যবান যন্ত্রপাতি চুরি হয়ে যায়। বিশাল কারখানা এলাকা এখন ফাঁকা মাঠ। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে আছে শ্রমিক কর্মচারীদের আবাসনের ধবংসাবশেষ আর পরিতক্ত্য

রিষড়ার জে কে স্টীল— বহুদিন ধরে দরজা বন্ধ।

ভেঙেপড়া কারখানার বিভিন্ন শেড। রেল লাইনের পশ্চিম দিকে বিশাল সার কারখানাটি বন্ধ হয়ে গেছে বহুদিন আগেই। রেললাইনের পূর্ব দিকে সার দিয়ে ছিল শ্রীদুর্গা কটন মিল, ইউনাইটেড ভেজিটেবিল — যার জমি কিছুটা এখন ভাগাড়ে পরিণত। রিসড়ার পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রভাসনগরে শ্রীইঞ্জিনীয়ারিং বহুদিন বন্ধ। যন্ত্রপাতি সহ অর্ধেক জমি বেআইনি ভাবে বেঁচে দেওয়া হয়েছে। রেললাইনের পশ্চিম পাড়েই কিমার বক্স কারখানার জমি প্রোমোটারদের দখলে। মাহেশে বন্ধ হয়ে যাওয়া বঙ্গলক্ষী কটন মিলের যন্ত্রপাতি চুরি হয়ে যাচ্ছে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের চোখের সামনেই। উত্তর পাড়ার শ'ওয়ালেশ কোনমতে টিকে রয়েছে। শ্রীরামপুরের জি টি রোড সংলগ্ন এশিয়া বেলিং বন্ধ হয়েছে বহুদিন আগে।

ব্যান্ডেল মগরায় ইষ্ট এন্ড পেপার মিল, হুগলীর সর্বোদয় রবার, এন নে স্টীল, উইন্ডো গ্লাস, বাঁশবেড়িয়ার কাঞ্চণ কেমিক্যাল, চুঁচুড়ার গ্লাস ফ্যাক্টরী, সেনকো বিস্কুট, নীলা বিস্কুট বন্ধ ব্যান্ডেল সাহাগঞ্জের বিখ্যাত ডানলপ কোর-এর কারখানা বহুদিন বন্ধ থাকার পর শিল্প উদ্যোগী পবন রুইয়া অধিগ্রহণ করেন এবং বারদুয়েক উৎপাদন শুরুর প্রচেষ্টার পর বর্তমানে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন। বাঁশবেড়িয়া শিল্পাঞ্চলের ছবিও সমান হতাশাজনক। ত্রিবেণী টিসু ও কেশরাম রেয়ণ এখন অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছে।

বন্ধ কারখানার তালিকায় রয়েছে র‍্যালিস ইন্ডিয়া — কোন্নগর, রিসড়ার শংকর টিউবস্, এইচ গুরু ইন্ড্রাষ্ট্রী, ইউ ভি এম — শ্রীরামপুরের আসাম টিউবস, বৈদ্যবাটীর সর্বোপরি স্টীল, প্রীতি প্রেসার, দেবস্টীল ইষ্টান রেলিং সিল ইত্যাদি।

১৯৯৫ সালের ১৫ এপ্রিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বহু মহাআড়ম্বরে ডানকুনিতে শিলান্যাস করেন একটি ফুড পার্কের। একই সাথে তিনি জানান ৩০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের কথা। কিন্তু আজও সেটা প্রতিশ্রুতির তালিকায় — রূপায়ণ হয়নি। কর্মকান্ড শুরু হয়েছে দেশের গো সম্পদ ধবংস করে ফুড প্রসেসিং এর কারখানা পৈলাম শিল্প গোষ্ঠীর উদ্যোগে। ডানকুনিতে বন্ধ হয়ে গেছে ভারত ব্যাটারী, সুপার ডিভ সহ অনেক ছোট মাঝারি শিল্প উদ্যোগ। নানা সমস্যায় জর্জরিত চুচুড়ার ধান্য গবেষণা কেন্দ্রটি। গবেষণার জন্য এখানে রয়েছে প্রায় ২০০ আসন বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র যা বর্তমানে অবহেলার শিকার। বর্তমান রাজ্য সরকার ওরফে বামফ্রন্ট সরকারের (পড়ুন সিপিএম সরকার) বহু ব্যয়ে প্রচারিত ঘোষণা 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যত'-এর বাস্তবায়নই কি বাস্তবায়িত হচ্ছে এই পুরাতন এবং বিখ্যাত গবেষণা কেন্দ্রটিকে ঘিরে।

এই জেলায় এক সময়ে সুতীর কাপড় উৎপাদনে উল্লেখ্যযোগ্য স্থান ছিল। বর্তমানে এন টি সি পরিচালিত চারটি সূতা কলের (Cotton Mill) মধ্যে রামপুরিয়া, বঙ্গলক্ষ্মী (আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) এবং বেঙ্গল ফাইন বন্ধ আর লক্ষীনারায়ণ ধুঁকছে।

নিয়মিত-অনিয়মিত ভাবে চলচিত্র প্রদর্শনের জন্য হুগলী জেলায় মোট ৫৪টি সিনেমা হল আছে। তার মধ্যে বর্তমানে বন্ধ আছে ১৪টি। চালু থাকা হলগুলির অধিকাংশের অবস্থা সঙ্গীন। নতুন সিনেমা হল একটাও তৈরি হয়নি।

সূত্রপাতে যে সিঙ্গুর নিয়ে বলা হয়েছে তার অবস্থা বর্তমানে অনিশ্চয়তায় ঢাকা। গাড়ি তৈরি হওয়া দূরের কথা কারখানা থাকবে না যাবে তাই এখন আলোচ্য। সরকার এই কারখানার জন্য নজীরবিহীন ভাবে জনগণের অর্থ ব্যয় করেছেন — কোন অদৃষ্ট এবং দুর্বোধ্য কারণে। অথচ বিশ্বমানের মোটর গাড়ি উৎপাদক হিন্দুস্থান মোটরস্-এর কারখানার অধিকাংশ উৎপাদন ব্যবস্থা বর্তমানে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত। বিষয়টি সরকারের অগোচরে নয় কিন্তু সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। জেলায় শিল্পের এই পরিণতির জন্য দায়ী দিশাহীন, অপরিণামদর্শী নীতি এবং নেতৃত্ব — যা এসেছে শ্রমিক আন্দোলন, মালিকদের অতি মুনাফার লোভ, সরকারের ভ্রান্ত পদক্ষেপ থেকে। এমনই নীতি ও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বর্তমানে শিল্পায়ণের ক্ষেত্রে। যার ফল শুধু দুর্গতি, উন্নতি নয়।

আজ জেলা রাজ্যের শিল্প উদ্যোগগুলি এক ভয়াবহ সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। চলেছে শ্রমিক শিল্পপতি সরকার — শ্রমিক সংগঠন-রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক চাপান-ওতোর। এতে কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না, হবারও নয়।

শিল্প স্থাপনের উদগ্র বাসনায় সরকার শিল্প উদ্যোগীকে সাহায্য সহযোগিতা দেওয়ার বাবদে প্রায় বাঞ্ছা কল্পতরু। বিপরীতে বন্ধ কারখানার একশ্রেণীর ইউনিয়ান নেতা আর স্থানীয় মাতববর ও মস্তানরা কারখানার জমি, যন্ত্রপাতি থেকে সাধ্যমতো উপার্জন করে দুধে-ভাতে আছেন। শ্রমিকেরা অসহায় আশ্রয়হীন।

কল্যাণী শিল্পাঞ্চল এখন গল্পকথা

বিশেষ সংবাদদাতা।। নদীয়ার কল্যাণী শিল্পাঞ্চলে ৯৬ টি ছোট ও বড় কলকারখানার মধ্যে বর্তমানে অর্ধেকের বেশি বন্ধ। বন্ধ কলকারখানাগুলির যা অবস্থা, এইসব বন্ধ গেটের তালায় এমন মরচে পড়েছে যা সহজে খোলার নয়। অনেক কারখানায় ভরা জঙ্গলে শেয়াল সাপ আস্তানা গেড়েছে। অনেক কারখানার টিনের শেড দরজা জানলা উধাও হয়ে গেছে। এইসব বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের দিন গুজরান হচ্ছে কেমন করে কেউ তার খবর রাখে না। শ্রমিক নেতারা যে যার ধান্দায় ব্যস্ত। বন্ধ কারখানার শ্রমিকের বাড়ির খবর কে রাখে? তবে কেউ মজুরগিরি করে কেউবা হকারি করে দিন চালাচ্ছেন। কল্যাণী শিল্পাঞ্চল গড়ার সময় মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কল্যাণীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রায় সকলকেই জমি দিয়েছিলেন। তাঁদের আশা ছিল জেলায় শিল্প হলে বেকার ছেলেরা চাকরি পাবে। কিন্তু লোকে ভাবে এক, আর হয় আর এক। পটাপট সব জমি সস্তায় বহিরাগত মালিকরা কিনে নিলেন। মালিকদের অধিকাংশ কল্যাণীতে এসেছিলেন টিনের সুটকেশ হাতে কিন্তু কারখানা বন্ধ করে আস্তানায় ফিরে গেছেন ভি আই পি সুটকেশ সঙ্গে নিয়ে। কেননা কারখানার জন্য জমি সংগ্রহ করেই এঁরা হাত পেতেছেন বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও সরকারি বেসরকারি অর্থলগ্নী সংস্থার কাছে। কোটি কোটি টাকা ঋণ পেয়ে কারখানা চালু করেছেন। প্রথম প্রথম শ্রমিকদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখেছেন। এরপর সুযোগ বুঝে ঝামেলা পাকিয়ে ঝাঁপ বন্ধ করে পালিয়েছেন। কেটে পড়ার আগে যেখানে যা বখরা দেওয়ার দিয়ে সব মুখ বন্ধ করে দিয়ে গেছেন। তবে শ্রমিকরা যেমন মাথায় হাত দিয়েছেন, তেমনি ব্যাঙ্ক ও সরকার ঋণের টাকা ফেরত পাননি। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত সাইকেল কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড ধুঁকতে ধুঁকতে শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ দিকে যে কজন শ্রমিক কর্মচারী ছিল তাদের ভি আর এস দিয়ে বিদেয় করে দেওয়া হয়েছিল। অপর একটি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত সংস্থা টায়ার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেডও বন্ধ হয়ে গেছে। কল্যাণী শিল্পাঞ্চলের অন্যতম বড় কারখানা প্যারিপস পেপার মিল আজ প্রায় ২০ বছর বন্ধ। কাগজ তৈরির এই কারখানাটির ব্যবসা মন্দ ছিল না, কিন্তু শ্রমিকদের নায্য পাওনা না দিয়ে কারখানটি বন্ধ। কারখানার ভিতর এখন সমাজবিরোধীদের আস্তানা। সোমানি ফেরো অ্যালয় অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে বহুকাল আগেই। হিমালয় রাবার এবং রূপনারায়ণ পেপার মিল বন্ধের প্রায় পনের বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কারখানার ভেতরে জঙ্গল গজিয়ে গেছে। দুটি কারখানার হাজার দুয়েক শ্রমিক আজ হতাশ। ধরেই নিয়েছেন আর কারখানা খুলবে না। কংকাস্ট ফাউণ্ডেশন কোম্পানিটি কল্যাণীতে কেন স্থাপন হয়েছিল তা আজও রহস্য। তামা ও পিতলের চাদর তৈরির উদ্দেশ্যে এই কারখানাটি খোলা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ ডলোমাইট সিমেন্ট কারখানাটি আজ প্রায় ২০ বছর বন্ধ। ইস্টার্ণ ক্রোম অ্যালায়েড কেমিক্যাল বন্ধ ১০ বছর। ক্রোম অ্যালায়েড কেমিক্যালস্ তৈরির এই কারখানার মালিক টাকা পয়সা নিয়ে বাড়ি চলে গেছেন। পারফেক্ট স্টিলে একাধিকবার মালিক বদল হয়েছে। যে মালিক আসে সেই ব্যাঙ্ক থেকে মোটা টাকার ঋণ নেয়। শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক আর টাকা দিতে চায়নি সেজন্য কারখানা বন্ধ।

বিধানচন্দ্র রায়ের মানসকন্যা কল্যাণীতে প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও ক্ষুদ্র বা মাঝারি মাপের কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার শিল্প শিল্প করে হরিনাম জপ করলেও কল্যাণী নিয়ে নিশ্চুপ। এ বিষয়ে তাঁদের কোনও দায় বা দায়িত্ব নেই।

কল্যাণী শিল্পাঞ্চলকে এভাবে খুন করার প্রচেষ্টা কেন? সরকার সিঙুর নিয়ে বড় বড় কথা বলছেন অথচ কল্যাণী শিল্পাঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি দিলে বহু বেকার ছেলের কর্মসংস্থান হবে। অথচ এ বিষয়ে সরকার একেবারে নিশ্চুপ।

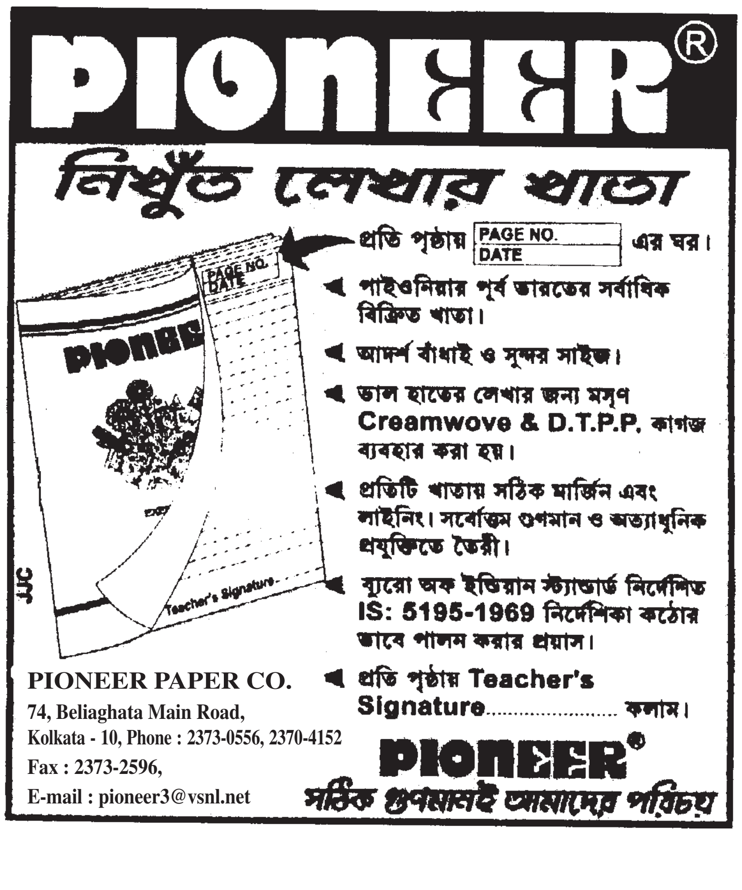

চিঠিপত্র

মুখ্যমন্ত্রীর শিল্পায়ন

স্বাধীনতার পরে বহু কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে সরকার অনেক প্রজেক্ট তৈরি করেছে, কিন্তু কোথাও সরকারকে সিঙ্গুরের মতো প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। অবিভক্ত বঙ্গদেশে কৃষিজমি ধবংস এবং কৃষক উচ্ছেদের সূচনা হয় গত বিশ্বযুদ্ধে র সময়। জাপানীরা মালয় ব্রহ্মদেশ দখল করে যখন বাংলার দিকে অগ্রসর হয় তখন বৃটিশ শাসকেরা সেনা-ছাউনী তৈরির জন্য যথেচ্ছভাবে কৃষি জমি দখল এবং গ্রাম থেকে চাষীদেরকে উচ্ছেদ করে হাজার হাজার চাষী পরিবারকে রাস্তার ভিখারীতে পরিণত করে। দেশভাগের পূর্বে বর্তমান পশ্চি মবঙ্গে কিছু জমি অধিগৃহীত হয়েছিল।

বর্ধমান জেলার পানাগড়ে ভেহ্‌কেল ডিপো, নিঙ্গা বিমানবন্দর, বিরুডিয়া বিমান বন্দর। মেদিনীপুরের কলাইকুণ্ডা বিমান ঘাঁটি তৈরি। দার্জিলিং-এর বাগডোগরা বিমান বন্দর এবং সেনা ছাউনী তৈরি ইত্যাদি। কলকাতার সবচেয়ে নিকটবর্তী রুজভেল্ট নগর (বর্তমানে কল্যাণী) তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য জেহাদ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে তৈরি কারখানাগুলো ধবংস করেছে কারা সে সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করার প্রয়াস অনুভব করছি। বিশেষ করে গত ৩০ বৎসরে মার্ক্সবাদী পশ্চি মবঙ্গে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের অবগতির জন্য জানাই — স্বাধীনতার কিছুদিনের মধ্যেই মার্ক্সবাদী নেতা পান্নালাল দাশগুপ্ত দমদম জেসপ কারখানায় জলন্ত বয়লারে কয়েকজন ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ারকে নিক্ষেপ করে জীবন্ত দগ্ধ করে ভারতে পুঁজিপতি উচ্ছেদের সূচনা করেন। অর্থাৎ ভিত্তি স্থাপন করেন। ওই ঘটনায় ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। পান্নালালবাবু গ্রেপ্তার হন, বিচারে তাঁর কারাদণ্ড হয়। জেলে গিয়ে তিনি গান্ধীবাদী হয়ে যান এবং কিছুদিনের মধ্যে ছাড়া পেয়ে শান্তিনিকেতনে 'আমার কুটীরে' আশ্রয় নেন। এরপর থেকে শ্রমিক আন্দোলনের নামে পশ্চি মবঙ্গে চলতে থাকে কথায় কথায় ঘেরাও, বন্‌ধ, স্লো-ডাউন, ওয়ার্ক টু রুল ইত্যাদি। '৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে মার্ক্সবাদী সরকার পুঁজিপতি উৎখাতের নামে শিল্পগুলিকে শ্মশানে পরিণত করে। সিঙ্গুরে টাটাদের কারখানা হলেই যে দেশের লোকর দারিদ্র্য দূর হবে তা মেনে নিতে পারছি না। তাহলে বিহারে টাটাদের সর্ববৃহৎ ইস্পাত কারখানা, বোকারো ইস্পাত কারখানা, ডি ভি সি-র ৫টা বাঁধ ও পাওয়ার হাউস এবং অফুরন্ত খনিজ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বিহার-এর আপামর জনগণ অত দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে কেন?

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য যেভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন এবং বিভিন্ন সভায় এবং সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তেজিত ভাবে বক্তব্য রাখছেন তাতে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে যদি তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাহলে সিপিএম-এ অন্য কোনও নেতা আছেন কি যিনি শিল্পায়নের জাহাজ কূলে ভেড়াতে পারবেন?

সবশেষে সাংবাদিক পবিত্র কুমার ঘোষের একটা লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা শেষ করছি, 'বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর চেয়ারম্যান ম্যাকনামারা একবার কলকাতা এসেছিলেন। সেই সময় বুদ্ধ, বিমান, অনিল তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন করেছিলেন। সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি সি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সত্যেন সেন রাজভবনে ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। সেজন্য শ্রীসেনের পিঠের চামড়া তুলে নিতে হুমকী দিয়েছিল এস এফ আই'। আর আজ বুদ্ধ বাবু টাটাদের রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, অদৃষ্টের কী পরিহাস!

রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪

"২১ নভেম্বর"

গত ২০০৭ সালের '২১ নভেম্বর' কলকাতার ইতিহাসে একটি কালোদিন হয়ে রইল। কারণ তসলিমা নাসরিন-কে বিতাড়নের দায়িত্বে কলকাতায় মুসলিম সমাজ যেভাবে তান্ডব প্রদর্শন করেছিল তা অতীব ভয়াবহ। এ তান্ডব ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার কথা মনে করিয়ে দেয়। সে সময় নিরস্ত্র হিন্দুদের ওপর মুসলিম দস্যুরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। দেখা যায় বেশির ভাগ আন্দোলনকারী উর্দুভাষী মুসলমান। ১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গায় কয়েকদিন হিন্দুরা একচেটিয়া মার খাওয়ার পর যখন 'শিখরা' অস্ত্র ধারণ করে তখন সুরাওয়ার্দি সরকার সেনাবাহিনী নামিয়ে মুসলমানদেরকে রক্ষা করে। এবারও মুসলিমদের রক্ষার ভূমিকায় 'বামফ্রন্ট' বন্ধুরা, তারা সেনাবাহিনীকে কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখে। যেভাবে ওরা বোমাবাজি ও অগ্নিসংযোগ করেছে তার জবাবে উচিত ছিল গুলি চালানো কিন্তু তা বুদ্ধ বাবু হতে দেননি।

বুদ্ধ বাবু যদি ওদের জঙ্গিপনাকে খুবই ভয় পান, তবে একটু চুপচাপ থাকুন। দেখুন ওদের তান্ডব কতদূর পৌঁছতে পারে। ৪৬-এর মতো প্রতিরোধ করার জন্য এ বাংলায় তিনটি সম্প্রদায়ই যথেষ্ট — নমঃশূদ্র, বিহারী ঘোষ (যাদব) ও শিখ। যাকে নিয়ে ২১ নভেম্বরের জঙ্গিপনা তিনি আবার দিল্লী পদার্পণ করেছেন। এখন আমরা দেখব বুদ্ধ বাবু মুসলিম ভয় কাটিয়ে উঠতে পারেন কিনা।

প্রদীপ দত্ত, বিএস রোড, মালদা।

সোনার ছেলে অভিনব

গত ২৫ আগস্ট 'স্বস্তিকায়' খেলার জগৎ বিভাগে জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবদূত অভিনব ভারতকেও জাতে ওঠালেন শীর্ষক আলোচনার প্রসঙ্গে এই নিবেদন।

নিজে সোনা জিতে ১২০ কোটি ভারতবাসীকে সোনালি পরশ এনে দিলেন 'অভিনব বিন্দ্রা'। ভারতীয় খেলাধূলার ইতিহাসে দিনটি সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ১৯২৮ সাল থেকে ভারত অলিম্পিকে দল পাঠাচ্ছে। এই প্রথম কোনও ভারতীয় ক্রীড়াবিদ ব্যক্তিগতভাবে সোনা জিতলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, চীনের উদাহরণটি। তারা প্রথম অলিম্পিকে যোগ দেয় ১৯৩২ সালে। প্রথম সোনা জেতে লস এঞ্জেলেস্ অলিম্পিকে ১৯৮৪ সালে। বলা যেতে পারে, চীনের প্রথম ব্যক্তিগত অলিম্পিকে সোনাটি জিতেছিলেন এক এয়ার রাইফেল শুটার হাইফেৎ জু। তারপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাদের, গত অলিম্পিকে সোনা জয়ের তালিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই তাদের স্থান ছিল। এবার চীন স্বর্ণপদকে প্রথম স্থানে। এই উদাহরণ প্রমাণ করে প্রকৃত ইচ্ছা থাকলে, এবং জেদ থাকলে, সাফল্য অধরা থাকে না। ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের অভিনব বিন্দ্রার সাফল্যটি একটি অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে।

তবে একটা কথা অবশ্যই বলতে হবে, চীনের ক্রীড়াবিদদের সাফল্যের সঙ্গে অভিনব বিন্দ্রার সাফল্যের এক মৌলিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য আছে। চীনের সাফল্য তাদের ব্যবস্থা পরিকাঠামোর ফসল, বিন্দ্রা ভারতের ক্রীড়া পরিকাঠামো ব্যবস্থার যাবতীয় প্রতিকূলতা, সীমাবদ্ধ তাকে অতিক্রম করে সফল।

সুশান্ত কুমার দে, কলকাতা-১০৩

বরুণ সেনগুপ্ত

আমাদের প্রিয় সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ বাংলা তথা ভারতের সংবাদ জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর কাছে আরও দীর্ঘদিন পাঠকদের অনেক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু তাঁর এই হঠাৎ চলে যাওয়ার সেই প্রত্যাশা পূরণ হয় না! তাঁর লেখার লক্ষ লক্ষ গুণমুগ্ধ পাঠকদের মধ্যে আমিও সমানভাবে মর্মাহত হয়ে ওনার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলছি।

বরুণ সেনগুপ্ত ছিলেন নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক। প্রথমে 'আনন্দবাজার', পরবর্তীকালে 'বর্তমান'-এ দেখেছি তাঁর অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে সহজ, সরল ভঙ্গীতে যে কোনও রাজনৈতিক ঘটনা ও সমস্যার বিশ্লেষণ। 'দৈনিক বসুমতী'-র হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 'যুগান্তরের' বিবেকানন্দ মুখার্জীর পর তিনিই বাংলার সংবাদ পাঠকদের মনে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেলেন। জরুরী অবস্থার সময় সাংবাদিক সুলভ সততা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্যে তাঁর কারাবরণ, বাংলা তথা ভারতের সংবাদ জগতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সাংবাদিকদের কাছে আদর্শ ও প্রেরণার নিদর্শন হয়ে কাজ করবে। এক জন বড় সাংবাদিক হয়েও তিনি কখনও প্রচারের আলোতে আসেননি, নাম-যশের কাঙাল হননি এবং অর্থের কাছে নিজের সামান্য সুবিধের জন্য হাত পাতেননি। মনে হয়, ওনার এই 'নির্লোভতা' ভবিষ্যৎ সাংবাদিকদের পথের দিশারী। 'অমৃতপথ যাত্রী' বরুণ সেনগুপ্তকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

রণজিৎ সিং, কলকাতা-৭০০০৩৬

সমাবেশ সমাচার

সংস্কার ভারতীর সোনারপুর শাখার নটরাজ পূজন

গত ২০ জুলাই মিলন পল্লীতে সংস্কার ভারতীর সোনারপুর শাখার 'নটরাজ পূজন' উৎসব এক ঘরোয়া পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল। ভাব সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনার পর সকল সদস্য-সদস্যারা 'নটরাজ' মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে প্রণাম জানান। শাখা সহ সভাপতি শঙ্কর প্রসাদ পাঠক গুরুপূর্ণিমা ও নটরাজ পূজনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এরপর করবী পাঠক, সৌরীন গাঙ্গুলী ও দ্বীপাঞ্জন নাথ প্রমুখ শিল্পীরা সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

অখন্ড ভারত দিবস ও শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবস

১৫ আগস্ট বারেন্দ্রপাড়ায় সংস্কার ভারতীর কার্যালয়ে 'অখন্ড ভারত দিবস ও শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবস'-এর কার্যক্রম পালন করা হয়। প্রদেশ সহ সভাপতি কমল ব্যানার্জ্জী, শাখা সম্পাদক অমিতাভ মুখার্জ্জী, শাখা সহ সভাপতি শঙ্কর প্রসাদ পাঠক প্রমুখেরা বলেন, যদি মনের মধ্যে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে নিজের 'মা' বলে মনে করে ভারতমায়ের অখন্ড মূর্তিকে কল্পনায় সদা জাগ্রত রাখতে পারি তবেই আজকের দিনটি স্মরণ করা সার্থক হবে। খোকন দেবনাথ, গৈরিক পত্রনবীশ, শুক্লা ব্যানার্জ্জী, অনিন্দিতা মুখার্জ্জী, শিবাশীষ রায়, সঙ্গীতা সর্দারের সঙ্গীত ও রাজীব চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি উল্লেখযোগ্য।

পশ্চি মবঙ্গে ৫০ হাজার সদস্য করার সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ

ভারতীয় কিষাণসঙ্ঘ শল্প চায় কিন্তু কোনভাবেই কৃষি ও কৃষকের স্বার্থক্ষুণ্ণ করে নয়। সম্প্রতি এই মর্মেই এক সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ। গত ২৮ আগস্ট বর্ধমানে অনুষ্ঠিত কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চি মবঙ্গের কার্যকারীমন্ডলের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিষাণ সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সম্পাদক মোহিনীমোহন মিশ্রের উপস্থিতিতে ঠিক হয় এবছর অর্থাৎ ২০০৯-এর মধ্যে পশ্চি মবঙ্গে ৫০ হাজার সদস্য করা হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ৯ থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত পশ্চি ম মেদিনীপুরে খড়্গপুরের কাছেই গোপালী আশ্রমে জৈবসার ব্যবহার, কীট নিয়ন্ত্রণ, হাস-মুরগী পালন, গো-পালন ইত্যাদি বিষয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

রাখী পূর্ণিমা ও জন্মাষ্টমী

রাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে গত ১৬ ও ১৭ আগস্ট ০৮ সোনারপুর শাখার সদস্য-সদস্যারা ৫০০ জনের হাতে রাখী বাঁধে ও রাখীর শুভেচ্ছা জানায়।

২৪ আগস্ট রবিবার ঘরোয়া পরিবেশে শাখার চর্চাকক্ষে 'জন্মাষ্টমী'র উৎসব পালিত হয়। শাখা সম্পাদক অমিতাভ মুখোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ-এর রাষ্ট্রীয় চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেন।

নবদ্বীপ

ওই একই দিনে জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করল সংস্কার ভারতীর নবদ্বীপ শাখা। সংস্থার ভাব সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। স্থানীয় শাখার ব্রহ্মচারী মহারাজ জন্মাষ্টমীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও ভজন, কীর্তন, ভক্তিমূলক সঙ্গীতও পরিবেশিত হয়।

ভারতীয় পোস্টাল এমপ্লয়ীজ ফেডারেশনের চিন্তন বর্গ

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ অনুমোদিত পূর্বাঞ্চল ডাক কর্মচারীদের সংগঠন — ভারতীয় পোস্টাল এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন-এর চিন্তন বর্গ গত ৩০ ও ৩১ আগস্ট কলকাতায় মজদুর সঙ্ঘের প্রাদেশিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল। বর্গে অসম, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, বিহার ও পশ্চি মবঙ্গের পদাধিকারীরা যোগ দেন। ওই বর্গে আগামী দিনের বিভিন্ন কার্যক্রম ও রীতি-নীতি নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সম্পাদক সুরেশ প্রসাদ সিনহা, সম্পাদক উমানাথ বাজপেয়ী এবং মজদুর সঙ্ঘের পশ্চি মবঙ্গ প্রদেশ সংগঠন সম্পাদক অমরকৃষ্ণ ভদ্র সহ অনান্য কার্যকর্তারা।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বলবীর দত্ত, খড়্গা সিং ও সুনীলা সৌবনী সম্মানিত

সংবাদদাতা।। রাষ্ট্রীয় সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সাংবাদিকতার ওপর চলতি বছরে (২০০৮) রাঁচী দৈনিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক বলবীর দত্ত, পুণের বিশিষ্ট মহিলা সাংবাদিক শ্রীমতী সুনীলা সৌবনী ও প্রসিদ্ধ চিত্র সাংবাদিক খড়্গা সিং কৈরা-কে সম্মানিত করা হয়েছে। গত ১৮ আগষ্ট গুজরাটের বরোদায় এক অনুষ্ঠানে জাতীয়তাবাদী সংবাদ প্রচারের জন্য বাবুরাও লেলের নামাঙ্কিত সাংবাদিক সম্মানে ভূষিত হন বলবীর দত্ত। অবিভক্ত পাঞ্জাবে তাঁর জন্ম। রাঁচিতেই তাঁর সাংবাদিকতার প্রথম হাতে খড়ি। রাঁচির একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক হিসাবে কাজ শুরু করেন। এরপর জয় মাতৃভূমি, দেশপ্রাণ সহ একাধিক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি কাজ করেছেন। এছাড়া বহু আন্তর্জাতিক পত্রিকাতেও তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ২৫০০-র বেশি প্রবন্ধ ও ৩৫,০০০-র মতো সম্পাদকীয় লিখেছেন। এডিটর্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়া, ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট, অখিল ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতির সঙ্গেও তিনি যুক্ত। বর্তমানে 'রাঁচি এক্সপ্রেস নামে দৈনিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক।

সাংবাদিকতার কাজে শ্রী বলবন্ত ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করেছেন।

৫১ হাজার টাকা নগদ ও শ্রীফল দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর প্রতিষ্ঠাতা দাদা সাহেব আপ্টের নামাঙ্কিত সম্মানে সম্মানিত করা হয় বিশিষ্ট চিত্র সাংবাদিক খড়্গা সিং কৌরাকে। শ্রী কৌরা-র জন্ম উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে। অর্গানইজার, ইউ এন আই প্রভৃতির সংস্থার হয়ে তিনি চিত্র সাংবাদিকতার কাজ করেছেন। তাঁর হাতে ২১ হাজার টাকা তুলে দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

বিখ্যাত মহিলা সাংবাদিক শ্রীমতী শান্তাবাঈ পরাঞ্জপের নামাঙ্কিত সম্মানে শ্রীমতী সুনীলা সৌবনীকে সম্মানিত করা হয়।

বেদের দেবতা বিশ্বকর্মা এখন যন্ত্রবিদ জনদেবতা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

বেদে যিনি বিশ্বস্রষ্টা, পুরাণে তিনিই দেবশিল্পী। বর্তমানে তাঁর পরিচয় শুধুই যন্ত্রের দেবতা। যুগে যুগে এমনভাবেই বদলে গেছে বিশ্বকর্মার পরিচয়। সময়ের কালচক্রে এযেন এক দেবতার অবমূল্যায়ণ। এমনকি, সব কিছুর মূল হয়েও বিশ্বকর্মা বৈদিক যুগের পর আর কখনই প্রধান দেবতার মর্যাদা লাভ করেননি।

অথচ বেদে তিনি স্রষ্টা, ধাতা, বিশ্বদর্শনকারী, বাচস্পতি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি, জয়স্বিশ্ব জাস্বিশ্বকর্মা বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ' ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮১ এবং ৮২ সূক্তে বিশ্বকর্মাকে বলা হয়েছে, সকলের প্রভু। চারিদিকে তাঁর মুখ। তাঁর হাত এবং পা প্রসারিত চতুর্দিকেই। দুই হাতে নানা পাখা নেড়ে নেড়ে সৃষ্টি করেন ভূলোক ও দ্যুলোক। যজ্ঞের ভাগ গ্রহণকারী সেই বিশ্বকর্মা নিজেই যজ্ঞ করে আপন দেহের পুষ্টি ঘটান। সমস্ত কল্যাণের উৎপত্তি তাঁর থেকেই।

সুধীর পিতার মতোই বেদের বিশ্বকর্মা জলে আবৃত এই দ্যাবা পৃথিবী সৃষ্টি করে পরবর্তীকালে তাদের আলাদা করে দেয়। তিনি বিরাট, মনও তাঁর বিরাট। তিনিই স্রষ্টা পালনকর্তা বা ধাতা। তিনি সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই বিধাতা। মানুষ এবং সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি এক এবং তিনিই আবার নানা নামে নানা দেবতা রূপে খ্যাত।

বেদে বিশ্বকর্মার অন্য নাম ত্বষ্টা। এই ত্বষ্টা অবশ্য বিধাতা বা সর্বশক্তিমান নন। এই ত্বষ্টা শিল্পী। তিনিই বজ্রের স্রষ্টা (ঋক ১।৩২।২), ব্রহ্মণস্পতির কুঠারে ধার দেন তিনি, তৈরি করে দেন দেবতাদের পানপাত্র (ঋক ১০।৫৩।৯) চমস। ত্বষ্টার হাতে রয়েছে লোহার বাঁশি, ছুতোরের কুঠার। পৌরাণিক যুগে সর্বশক্তিমান বিশ্বকর্মা আর শিল্পী ত্বষ্টা মিলে মিশে এক হয়ে যান। এখানে বড় হয়ে ওঠে তাঁর শিল্পী সত্ত্বা। তিনি হয়ে ওঠেন দেবশিল্পী, স্থপতি, যন্ত্রবিদ। বেদে তিনি সর্বশক্তিমান বিধাতা। সেখানে তিনি স্বয়ম্ভু। কিন্তু পুরাণে এসে পাওয়া যায় তাঁর জন্ম পরিচয়। বৃহস্পতির বোন বরস্ত্রী। যোগ-সাধনায় সিদ্ধ বলে তাঁর অন্য নাম যোগ সিদ্ধা। সিদ্ধি লাভের পর পর্যটন করেন তিনি। বিয়ে হয় তাঁর বসু প্রভাসের সঙ্গে। এই বরস্ত্রী আর প্রভাসের ছেলেই বিশ্বকর্মা। তাঁর স্ত্রী ঘৃতাচী। সাধারণ একটা প্রবাদ 'বিশ্বকর্মার ছেলে ছুঁচো'। কিন্তু পুরাণ মতে তাঁর ছেলেদের নাম সমুদ্রে সেতু নির্মাণকারী নল, পৃথিবীর সমস্ত সোনার অধিকারী অজৈকপাদ, অহির্ব্যুধ্ন্য, ত্বষ্টা এবং রুদ্র। বিশ্বকর্মার চারটি মেয়ে। তাদের নাম সংজ্ঞা, চিত্রাঙ্গদা, সুরূপা এবং বর্হিষ্মতী।

বিশ্বকর্মার চার মেয়ের মধ্যে সুরূপা আর বর্হিষ্মতীর বিয়ে হয় মনু ও শতরূপার ছেলে প্রিয়ব্রতর সঙ্গে। এই দুটি মেয়েকে নিয়ে বিশ্বকর্মাকে তেমন কোনও ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়নি। কিন্তু সংজ্ঞা এবং চিত্রাঙ্গদাকে নিয়ে বিশ্বকর্মাকে বেশ বিপদে পড়তে হয়। সংজ্ঞার সঙ্গে বিয়ে হয় সূর্যের। কিন্তু সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে নিজের ছায়ামূর্তিকে রেখে সংজ্ঞা চলে যান বিশ্বকর্মার কাছে। কিন্তু বিশ্বকর্মা তাঁকে আবার সূর্যের কাছেই চলে যেতে বলেন। অভিমানে সংজ্ঞা উত্তর মেরু প্রদেশে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। ওদিকে সূর্য সব কিছু জানতে পেরে বিশ্বকর্মার কাছে যান তাঁর তেজ কমিয়ে দেওয়ার জন্য। বিশ্বকর্মা তখন সূর্যকে বসান তাঁর ভ্রমিযন্ত্রে। ছেঁটে ফেলেন তাঁর বাড়তি তেজ।

সেই ছেঁটেফেলা তেজ দিয়ে তিনি তৈরি করে দেন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র। শিবের অস্ত্র ত্রিশূল ও ধনুক পিনাক, এবং দেবতাদের জন্য নানা রকম অস্ত্র।

বিশ্বকর্মার অগোচরে তাঁর মেয়ে চিত্রাঙ্গদা নৈমিষারণ্যেরাজা সুদেবের ছেলে সুরথের প্রেমে পড়েন। জানতে পেরে ক্রোধে অন্ধ বিশ্বকর্মা অভিশাপ দেন, তার বিয়েও হবে না স্বামীপুত্রও পাবে না। বিশ্বকর্মার অভিশাপের ফলেই সরস্বতী নদী ভাগিয়ে নিয়ে যায় স্নানরত সুরথকে। শোকে, বিরহে চিত্রাঙ্গদাও ঝাঁপ দেন সরস্বতীতে। ভাসতে ভাসতে চিত্রাঙ্গদা পৌঁছান গোমতীর তীরে এক শ্বাপদ সঙ্কুল বনে। সেখানে যক্ষ গুহ্যকের পরামর্শে চিত্রাঙ্গদা যান শ্রীকান্তের মন্দিরে। ওই মন্দিরে তাঁর দেখা হয় মুনি ঋতধবজের সঙ্গে। সব শুনে ঋতধবজ বিশ্বকর্মাকে অভিশাপ দেন, মেয়ের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করার জন্য তোমাকে বানর হয়ে জন্মাতে হবে। সেইসঙ্গে চিত্রাঙ্গদাকে আশীর্বাদ করে বলেন, ভয় নেই, শেষ পর্যন্ত তোমার স্বামীর সঙ্গে মিলন হবে।

মুনি ঋতধবজের অভিশাপে বিশ্বকর্মা হন বানর। তারপর নানা ঘটনার পর স্ত্রী ঘৃতাচীর গর্ভে তাঁর 'নল' নামে পুত্রের জন্মের পর বিশ্বকর্মা হন শাপমুক্ত। চিত্রাঙ্গদারও শেষ পর্যন্ত মিলন হয় সুরথের সঙ্গে। বিশ্বকর্মা বানর অবস্থায় ঋতধবজকে শাস্তি দিতে তাঁর ছেলে জাবালিকে একটি গাছের ডালে বেঁধে রেখে দিলেন। হাজার বছর ওই অবস্থায় থাকায় ডালটি জাবালির পিঠে একবারে গেঁথে যায়। শেষে বিশ্বকর্মাই সেই ডালটি জাবালির পিঠ থেকে খুলে দেন। এর থেকে বোঝা যায়। বিশ্বকর্মা শুধু শিল্পী নয়, ছিলেন শল্যবিদও।

শুধু শল্যবিদ নয়, বিশ্বকর্মা ছিলেন চিকিৎসা শাস্ত্রে অতি দক্ষ। শরীর থেকে কোষ তুলে নিয়ে নতুন জীবন সৃষ্টির ক্ষমতাও ছিল তাঁর।

সেবার সুন্দ ও উপসুন্দর হাতে বিধবস্ত দেবতারা ছুটে আসেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা কিন্তু নিজে কিছু না করে বিশ্বকর্মাকে বলেন, সৃষ্টি করো।

ব্রহ্মার নির্দেশে বিশ্বকর্মা ত্রিভুবনের সমস্ত সুন্দর সৃষ্টি থেকে একটু করে নিয়ে তৈরি করলেন অপরূপা তিলোত্তমা। তিলোত্তমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সুন্দ ও উপসুন্দর কাছে। একা তিলোত্তমাকে ভোগ করার জন্য পরস্পর লড়াই শুরু করে তারা। সে আছে যুদ্ধে মারা যায় সুন্দ ও উপসুন্দ দুজনেই। দেবতারা হল বিপদমুক্ত।

বিশ্বকর্মাই তৈরি করেন শ্রীক্ষেত্র পুরী মন্দিরের বিগ্রহ জগন্নাথের মূর্তি। সেও এক কাহিনী। নীলাচলে মন্দিরে নীলমাধবের মূর্তি স্থাপন করবেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। মূর্তি বানাবার দায়িত্ব নিলেন বিশ্বকর্মা। শর্ত হল, বিশ্বকর্মার কাজ সৃষ্টির আগে কেউ তা দেখতে পেলে তিনি মূর্তিকে সেই অবস্থায় রেখেই চলে যাবেন। বেশ কয়েকদিন পরেও বিশ্বকর্মা মূর্তি দেখার জন্য আহ্বান না করায় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ব মন্দিরে ঢুকে পড়েন কাজ দেখার জন্য। বিগ্রহের তখনও হাত তৈরি বাকি। শর্ত মতো বিশ্বকর্মা সঙ্গে সঙ্গে চলে যান সেখান থেকে। সে কারণেই জগন্নাথ হস্তহীন।

স্থপতি হিসেবে বিশ্বকর্মাই সৃষ্টি করেন অপরূপ কিস্কিন্ধ্যা নগরী। গড়েন স্বর্ণালঙ্কা। স্বর্গ, যম ও বরুণের প্রাসাদ ও নির্মাণ করেন তিনি তক্ষন শিল্পী হিসেবে বিশ্বকর্মাই তৈরি করেন শিবের রথ। অস্ত্র নির্মাতা হিসেবে ইন্দ্রের বজ্র, 'বিজয়' নামে ধনুকও তাঁরই তৈরি।

চিকিৎসা বিদ্যায় পারঙ্গম বিশ্বকর্মার আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল ছিন্নমস্তক বিষ্ণুর দেহে একটি ঘোড়ার মুণ্ড জুড়ে দেওয়া। সেদিন থেকে ঘোড়ার মুণ্ডুযুক্ত বিষ্ণুর নাম হয় হয় গ্রীব।

বিশ্বকর্মা আকাশযান নির্মাণেও ছিলেন সমান দক্ষ। গগন বিহারী পুষ্পক রথও তাঁরই সৃষ্টি। দেবতাদের জন্য বিমানও তৈরি করেন তিনিই।

স্থপতি বিশ্বকর্মাই ভরদ্বাজের আহ্বানে ভরতকে আপ্যায়নের জন্য তৈরি করে দেন অতিথি শালা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিয়েই নির্মাণ করান দ্বারকাপুরী।

সব মিলিয়ে বিপুল শক্তি ও মেধার অধিকারী বিশ্বকর্মা হলেন ৬৪ কলা বিদ্যার দেবতা। সেইসঙ্গে তিনি রচনা করেন 'স্থাপত্য বেদ' নামে একটি উপবেদ।

বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগের এমন অসাধারণ মেধার অধিকারী দেবতা পরবর্তীকালে কেমন করে শুধুই যন্ত্রের দেবতায় পরিণত হলেন তা বলা খুবই শক্ত। তবে কামময় দেবতা বিশ্বমকর্মা দেবতাদের রাজ্যে এক অনন্য দেবতা। বহুগুণের অধিকারী বিশ্বকর্মার অবমূল্যায়ণ হলেও তিনি এখন যে একজন শ্রেষ্ঠ জনদেবতা তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সমাজ সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গ

ঃ রেজিস্টার্ড অফিস ঃ

৫৮সি/১ সি, টালিগঞ্জ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৩৩

ঃ যোগাযোগ কার্যালয় ঃ

২৭/১বি, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬

আবেদন

আসন্ন দুর্গাপূজায় আমাদের সকলের মত সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র, অবহেলিত ও দুঃস্থ বালক-বালিকারাও যাতে আনন্দে ও হাসিমুখে মায়ের দর্শন করতে পারে, তারাও যাতে ধূলি-মলিন ছেঁড়া পোষাকের পরিবর্তে নূতন পোষাক পরতে পায় এ হেন ভাবনা প্রসূত হয়ে সমাজ সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, প্রতি বছরের ন্যায় এবারো এক হাজার শিশুর মুখে হাসি ফোটানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সমাজের দায়িত্বশীল, উদারহৃদয়, সজ্জন নাগরিকবৃন্দের কাছে আমাদের বিনীত প্রার্থনা কমপক্ষে একজন শিশুর নূতন পোষাকের অর্থ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।

ঃ অর্থ সাহায্যের ঠিকানা ঃ

সমাজ সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গ

'কেশব ভবন',

৯এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬

ফোন নং ঃ ৯৮৭৪৩৯৯২৬৪, ৯৪৩২০৭০৮৭১

বিঃ দ্রঃ —

১। নতুন পোষাকও পাঠাতে পারেন

২। 'সমাজ সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গ' — এর অনুকূলে চেক্ পাঠাতে পারেন।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

সেবাই পরম ধর্ম

বোধ কথা

সতীনাথ রায়

সত্যানন্দ মহারাজ নদীতে স্নান সেরে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। কাল রাতেই ঠিক হয়েছিল নিত্যানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাই ভোর ভোরই স্নান সেরে রওনার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। আশ্রমের শিষ্যরা তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। শুধু বিপিন আর তাপস কাজে ব্যস্ত ছিল। কাল রাতেই গুরুজীর বাইরে যাবার কথা জানতে পেরেই ঠিক করেছিল মাহারাজের জন্য একটু জল খাবারের ব্যবস্থা করবে। গুরুজীর স্নানের আগেই তারা সবকিছু সেরে ফেলেছিল। মহারাজের পুজো-অর্চনা শেষ হতেই বিপিন খাবারের পাত্রটা এগিয়ে দিল। দীর্ঘ হাঁটা পথ। পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিকাল গড়িয়ে আসবে, খিদে পাওয়াটা যে স্বাভাবিক তা মহারাজও জানতেন। কোনরকম দ্বিরক্তি না করেই মহারাজ খাবার খেতে শুরু করলেন। রাস্তাতেও যাতে দুমুঠো খাবার খেয়ে নিতে পারেন, তাপস কিছু শুকনো খাবারও তাই গুরুজীর থলেতে পুরে দিল। সত্যানন্দ মহারাজ তাপস ও বিপিনকে কিছু কাজ সেরে রাখার নির্দেশ দিয়ে রওনা হলেন। একটু যাওয়ার পরেই মহারাজ দেখলেন, নদীতে দুটি হাত জলের ওপরে ভাসছে। কাউকে যেন ইশারা করে ডাকছিল। সত্যানন্দ ভাবলেন, হয়ত তাঁর নিজের সঙ্গী সাথীকে ইশারা করছে। তাই আবার হাঁটতে শুরু করলেন। নদীর আরও কাছে আসতেই দেখলেন, তখনও হাতদুটি নড়ছে। আর ক্রমশ তা জলের নীচে ডুবে যাচ্ছে। তিনি দ্রুত এগিয়ে এসে দেখলেন, একজন সন্ন্যাসী চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছেন। তাঁর সামনেই মাঝ নদীতে একজন জল থেকে ওঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই জল থেকে উঠতে পারছিল না। তখনও সকাল হয়নি। ভোরের লাল আভায় শুধুমাত্র রাস্তাটুকুই দেখা যাচ্ছিল। মহারাজ অবাক হয়ে গেলেন সন্ন্যাসীর আচরণে। একজন মরতে চলছে অথচ তিনি নির্বিকারে ধ্যান করে চলেছেন। সত্যানন্দ দেখলেন, আর সময় নষ্ট করা যাবে না। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই জলে ঝাঁপ দিয়ে তাঁকে জল থেকে তুলে আনলেন। সন্ন্যাসীর সামনে গিয়ে দেখলেন, এখনও তিনি চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছেন। সত্যানন্দ জোরে ডাক দিলেন — এই যে শুনছেন? প্রথম ডাকে সন্ন্যাসীর উত্তর না পেয়ে তিনি আবার জোরে চিৎকার করলেন — এই যে, কিছু শুনতে পাচ্ছেন। এবার সন্ন্যাসী রেগে উত্তর দিলেন, আমি কী কানে কম শুনি, যে এত চিৎকার করছেন।

— তাহলে আপনি সবই জানেন?

— হ্যাঁ জানি, তাতে কী হয়েছে?

একজন মরতে চলেছিল আর আপনি তাকে বাঁচাবেন না?

— বাঁচাতে গেলে আমার একগ্রতা যে নষ্ট হয়ে যেত। ধ্যান করাটাও পন্ড হয়ে যেত।

— সাবাস! তা আপনার একগ্রতা কী এসেছে?

না, তা আর আসতে দিলেন কোথায়?

সত্যানন্দ মনে মনে বললেন, এখনও তেমন আলো ফোটেনি, তা না হলে দেখতেন লোকেই ওকে বাঁচাতো।

সন্ন্যাসী বললেন — আমি দেখছি, আপনিও তো একজন সাধু সন্ন্যাসী। আপনি কী ধ্যানের মর্ম বোঝেন না?

— সত্যানন্দ মহারাজ উত্তরে বললেন, ধ্যানের সাফল্য কাজের মধ্যে আসে। যদি আপনি ওকে বাঁচাতেন তাহলে আপনার মনের একগ্রতার এতক্ষণ ব্যাঘাত ঘটত না। ঈশ্বরের সন্তান হয়ে আপনি তাঁর আর এক সন্তানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে ধ্যান করেছেন, এটাতো আরও পাপের। আপনি নিজের ইচ্ছা পুরণ করতে কখনও অপরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারেন না। সন্ন্যাসীর মাথা নীচু হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন, প্রতিবেশী সুখে থাকলে তবেই নিজের সুখ। সুখ বা আনন্দকে কুক্ষিগত করে রাখা যায় না। ভগবানের কাছে ধ্যানের চাইতে সেবাই বেশি প্রিয়। শাস্ত্রেও আছে সেবাই পরম ধর্ম। সত্যানন্দ দেখলেন, সন্ন্যাসীর উগ্র রূপের পরিবর্তন হয়েছে।

তাই আর কিছুনা বলে গন্তব্য স্থলের দিকে রওনা দিলেন।

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। সতের

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

নির্মল কর

যযাতির স্বপ্ন

বার্ধক্য জরা থেকে মুক্তি পেয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কী অনন্ত যৌবনের অধিকারী হতে চলেছে? সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আই আর এস-১ নামে এক জিনের সন্ধান পেয়েছেন। গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, এই জিনই বার্ধক্য টেনে আনে। জিনটি বাদ দিলে মানুষের স্বাস্থ্য হবে উজ্জ্বল ও নীরোগ। ফলে অনন্ত যৌবন কে আটকায়? মুষিকের ওপর চালানো পরীক্ষা মানুষে প্রয়োগের কথা ভাবছেন গবেষকেরা। 'দি গার্ডিয়ান' এ খবর দিয়েছে।

রোবট হৃদয়

কে বলে রোবটের মন নেই? রীতিমতো ধুক্‌পুক করছে এর হৃৎপিন্ড। হাসছে, কাঁদছে, ভয় পাচ্ছে সে। টের পাচ্ছে মানুষের আবেগ — সাড়াও দিচ্ছে। লন্ডন মিউজিয়ামের সব থেকে বড় আকর্ষণ এখন এই রোবট। তার সঙ্গে ভাব জমাতে উপচে পড়ছে শিশুর দল। আর এক আকর্ষণ ৬ পায়ের মাকড়সা রোবট 'হেকাপড়'। ছোটদের ভাব বুঝে জবাব দিচ্ছে ভিডিও-তে। দুই রোবটই বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিকতম বিরাট সাফল্য।

মাথা বাঁচাতে

বি এম ডব্লিও নামে একটি সংস্থা গাড়ি দুর্ঘটনায় যাত্রীদের মাথা বাঁচাতে এক রকম 'হেডব্যাগ' বের করেছে, যা গাড়ির জানলার কাঁচের গায়ে আড়াআড়ি ভাবে আটকে দেওয়া যাবে। দ্রুতগামী গাড়িতে হঠাৎ ব্রেক কষলে অথবা গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লে যাত্রীর মাথা জানলার কাঁচে ঠুকে গেলেও ঘাতে আঘাত না লাগে সেজন্যই এই ব্যবস্থা।

অমৃত তামাক

যে-তামাক ক্যানসারের কারণ, সেই তামাকের পাতা থেকেই কয়েক ধরনের ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কারের সম্ভাবনা দেখছেন বিজ্ঞানীরা। নন-হজ্‌ কিন্‌স গোত্রের ক্যান্সারের এই প্রতিরোধী সৃষ্টির প্রচেষ্টা ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যান ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের। তাঁদের মতে, অপেক্ষাকৃত সহজতর প্রক্রিয়ায় সামান্য পরিমাণ তামাক পাতা থেকে প্রচুর পরিমাণ ওষুধ তৈরি সম্ভব।

পাখি কেন গায়

বসন্তেই কেন গান ধরে কোকিল, দোয়েল ময়না? শুধুই কি প্রাকৃতিক কারণে? 'নেচার' জার্নালে গবেষক পিটার শাপ জানিয়েছেন, বসন্তে দিন বড়, আলো বেশি। ঠিক ওই সময় পাখিদের বার্তা পাঠায় তাদের মস্তিষ্ককোষে। বার্তা পেয়েই সঙ্গীর খোঁজে বের হয় পাখিকুল। মনের মতো সঙ্গীকে কাছে ডাকতেই এত গান।

দূষণ পাথর

কিড্‌নিতে পাথরের মতো সমস্যা ডেকে আনছে পরিবেশ দূষণ। মানবদেহের ওপর সরাসরি দূষণের এই প্রভাব সম্প্রতি এক সমীক্ষায় ধরা পড়েছে। আমেরিকা বা তার আশেপাশেই এই সমস্যা এখন সবচেয়ে বেশি। উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে। গবেষকদের আশঙ্কা, ২০৫০ সাল নাগাদ ২২ লক্ষ মানুষ কিড্‌নিতে পাথরের সমস্যায় ভুগবেন।

জগন্নাথ সংস্কৃতিতে নিবেদিত এক রাশিয়ান নারী

কিরণশঙ্কর মৈত্র ।। লোকে বলে — ছ' বছরেও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনায়েক ওড়িয়া ভাষা শিখে উঠতে পারেননি, কিন্তু রাশিয়ার এই মহিলা আলবিরা ছ'মাসের মধ্যেই এই ভাষা আয়ত্ত করেছেন। শুধু তাই নয় — ৩৭ বছরের আলবিরা, যার নতুন নাম 'অবন্তিকা' নিখুঁত উচ্চারণে গাইতে পারেন জয়দেবের গীত গোবিন্দ, বনশালী ইত্যাদি।

অবন্তিকা বলেন — তিনি জগন্নাথ-সংস্কৃতিতে উৎসাহী ছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন এই ভাষা না শিখলে একে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তিনি ছ'মাসের মধ্যে ওড়িয়া ভাষা শিখে নিলেন এবং অনুভব করলেন — এই ভাষা না শিখলে জগন্নাথদেব সংস্কৃতি বোঝা সম্ভব নয়। ওড়িয়া ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক বইগুলি তিনি কিনে নেন, তারপর লোকেরা যখন নিজেদের মধ্যে এই ভাষায় কথা বলত তিনি মনোযোগ দিয়ে তা শুনতেন। ভাষা শেখার জন্যে তিনি কোনও প্রথাসিদ্ধ পাঠ গ্রহণ করেননি, কিন্তু সব সময় এই ভাষায় কথা বলবার চেষ্টা করেন।

ইসকন (ISKCON)-অনুরাগিনী অবন্তিকা বছরে অন্তত তিনবার পুরী যান। তিনি প্রথম বিদেশিনী যিনি জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান দ্বার লায়নস গেটের স্নান পূর্ণিমার সঙ্গীতানুষ্ঠানে ওড়িয়া গীত গেয়েছেন। এখানকার আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি কংগেসেও তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন।

তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর এবং ওড়িয়া উচ্চারণ উত্তম — বলেন শহরের মীরা মিউজিক স্কুলের সঙ্গীত শিক্ষিকা নলিনী কান্তা নায়ক। নলিনীর স্কুলে তিনি কিছু দিন সঙ্গীত শিক্ষার পাঠ নিয়েছেন এবং প্রতিদিন একঘন্টা তিনি অভ্যাস করতেন। ওড়িয়া গান তিনি ইংরেজি বর্ণমালায় লিখে নিতেন, তারপর নিঁখুতভাবে ওড়িয়া শব্দ উচ্চারণ অভ্যাস করেন। অবন্তিকা বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ভুবনেশ্বরী মিশ্রের কাছেও সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন। মিত্র বলেন — আমি বিস্মিত যে অবন্তিকা অতি সহজে ভক্তিমূলক গান করেন। আমি আরও চারজন বিদেশীকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু অবন্তিকা 'বেস্ট'।

জগন্নাথ সংস্কৃতিতে তার আগ্রহের কথা বলতে গিয়ে অবন্তিকা জানান যে যখন এই শ্লোক উচ্চারিত হতো আমি একটা ঘোরের (trance) মধ্যে অবিষ্ট হতাম, আমি আমার অন্তরে তাঁর ঐশ্বরিক উপস্থিতি অনুভব করতাম। আমি এখন জগন্নাথ সংস্কৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচার করতে চাই। আরব দেশ সহ বিশ্বের অনেক জায়গায় আমি ভ্রমণ করেছি। এবং আরও অনেক জনপদে যাবার ইচ্ছে রয়েছে।

প্রচণ্ড তাপ ! কি কাণ্ড বাপ !

অমিতাভ সেন

শ্রীপরমহংসদেবের একান্ত ভক্ত ডাক্তার শীতল ব্যানার্জীও চান শ্রীখণ্ড গ্রাম ও এতৎ অঞ্চ লের উন্নতি হোক। কংগ্রেসের নেতা গাড্ডু বাবু বা সি পি এম-এর ভুতুবাবুর আন্তরিক চাহিদা একই — কাটোয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হোক, বর্ধমান-কাটোয়া ব্রডগেজ, হাওড়া-কাটোয়া ডবল লাইন হোক ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ডাক্তারবাবুর প্রার্থনা আর রাজনৈতিক নেতাদের হিসেবের মধ্যে একটা ফারাক আছে। দ্বিতীয় পক্ষরা চান সার্বিক উন্নয়ণের প্রতিফলন যেন ভোটের বাক্সে থাকে — অর্থাৎ দুধের বাটি একলা সাঁটি। P.D.C.L এর ভূমিপূজন (থুড়ি, এ নরেন্দ্র মোদীর আখড়া নাকি?) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সি পি এম নেতারা বক্তৃতায় রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের ফাটা কাঁসি বাজিয়েছেন। অপরদিকে কাটোয়া কেন্দ্রে চার রাউণ্ডের বিজয়ী কংগ্রেস এম এল এ রবিবাবু বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে এই অঞ্চ লকে সতীনপীঠ এ পরিণত করেছে তা বিশ্লেষণ করেছেন। উন্নয়ণের রিক্সায় সি পি এম নেতারা কংগ্রেসীদের ঠাঁই দেননি। অপরদিকে অচিরেই কিভাবে রিক্সার পেছনের টায়ার পাংচার করা যায় সেই চেষ্টা করে গেছেন কংগ্রেস নেতারা। দু পক্ষই বাঘের ল্যাজ দিয়ে কানে সুড়সুড়ি খাচ্ছেন। মাটির মালিক দু পক্ষই নন। দলিল-পাট্টা রয়েছে রামা কৈবর্ত্য-হাসেম শেখের কুলুঙ্গিতে।

কাটোয়া এমনিতেই তিনটে জেলা — বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-নদীয়া-র মুখসত্র। নাথুলা পাস খুলে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু হলে কাটোয়া হবে সেকেন্ড গেটওয়ে। পেছনেই রয়েছে গঙ্গা ও অজয়ের কন্‌ফ্লুয়েন্‌স্‌; কাজেই রাণীগঞ্জের মাঠ আর উদ্ধারণপুরের ঘাট যেন এক্কেবারে রাজযোটক সন্নিপাত। এমনিতেই সাগরদিঘী প্রকল্পে মার্কসতুতো চীনা কোম্পানী ড্যাং ফ্যাং বামফ্রন্ট সরকারকে ভীষণ বেগ দিয়েছে। লাল ফিতে কাটার তেরাত্তির পার হতে না হতেই গোটা প্ল্যান্ট দেহ রেখেছে। প্রাপ্তির ঘরে লবডংকা। অন্যান্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোরও জীবনীশক্তি স্বাভাবিক নিয়মেই ক্ষীয়মান। এমনি চলতে থাকলে কলকারখানা বিদ্যুৎ পাবে না, সমস্ত গ্রাম শহর অন্ধকারে ডুববে। শহরের বাবুদের আরাম দেবার লেগে শুধু ছিখন্ডের চাষাগুলোর পেছন (মার্জিত রূপ) মারতেহবে না কি? এককড়ি দাসের কঠিন মন্তব্যে সকলে চমকে উঠলো। ভাদ্রমাসের পচা গরমে সারা দুপুর সে জমি নিড়িয়েছে (Weeding out)। চায়ের দোকানে এসেছে সবেমাত্র। আলোচনার প্রথম অংশ সে শোনেনি। ল্যজ অংশ, গ্রাম ও শহরের বিভাজন। তার মনের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে।

এককড়ি গজগজ করতেই থাকে — বাবা পিতামোর চারফসলি জমি আমাদের — সকলে কথা কয়, গরমেন্ট ভড়কি দিয়ে কেড়ে নেবে। দোবো না। বয়ঃজ্যেষ্ঠ হেমা কৈবর্ত্য বললো — ডাক্তার বিধান রায়ের আমলে যখন কেনেল কাটা হয় তখন তোমার বাপ পিতামো তো ক্ষেতি স্বীকার করেছিলো, জমি দিয়েছিলো। আগে তো রাশি ধান ঘরজাত করার পর ডাঙাজমিতে ধম্মরাজের ষাঁড় শুধু চড়ে বেড়াতো। কেনেল কোম্পানীর নেগেই তো বোবা জমি বাচাল হয়েছে, চারডে করে ফসল পাচ্ছো।

এইটুকু তর্ক করেই কৈবর্তকত্তা হাঁপাতে লাগলো, থেলো হুঁকোয় টান দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

সামাজিক স্তরে এই সব আলোচনা সভা করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল পি ডি সি এল-এর। এবছর জানুয়ারিতে শ্রীখণ্ড হাইস্কুলের শতবর্ষ উদ্‌যাপন সম্পন্ন হল। মাননীয় পণ্ডিত শিক্ষকবর্গ থাকায় এই তল্লাটের সকল গ্রামের ছাত্ররা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পাঠ নেবার জন্য শ্রীখন্ড হাইস্কুলে পড়তে আসতো। সেদিনের সেই ছাত্ররা আজ বিভিন্ন গ্রা ম মুখ্য। শতবর্ষ উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে এ অঞ্চ লের নতুন প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে যদি 'কৃষি শিল্প বিদ্যুৎ' ইত্যাদি শীর্ষক বিতর্ক বা আলোচনা সভা, সেমিনার আয়োজন করা যেত তাহলে পজিটিভ জনমত তৈরি করা যেত। জমির সঙ্গে যাদের নাড়ীর টান থাকে জমি থেকে উচ্ছেদকে তারা মাতৃবিচ্ছেদ বলে মনে করে। এদের অনেকেই অপারেশন বর্গা যুগে পাট্টাদার হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কারের পদ্ধতি অন্যান্য রাজ্য সরকার প্রশংসা করেছে, কিন্তু কেউই ওপথে পা বাড়ায়নি। ষাটের দশকে অটোমেশন / কমপিউটর এর বিরোধিতায় কলকাতা যখন উত্তাল, বিদেশী

> "'আমরা ওরা' এই ধরনের বাচালতা, ২৩৫ বনাম ৩০ এর ঔদ্ধত্য অনেকের কানেই বেসুরো লেগেছে। তাই 'চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা' শতবার গাইলেও কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না।"

কোম্পানীগুলো কলকাতার পাট চুকোলেও বেশী দূরে যায়নি। আমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদে ঘাঁটি গেড়ে ছিল। আজকে লেখাপড়া থেকে চিকিৎসা সকল প্রয়োজনে ট্রেন উপচে বঙ্গ সন্তান দক্ষিণে ছুটছে। ওইসব প্রদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব মানতো যে বিশ্বায়ন ও শিল্পায়ন একটা অপ্রতিরোধ্য বাস্তবতা। ইউরোপ-আমেরিকার মানুষের ভোগক্ষমতা সুপারস্যাচুরেশনে পৌঁছে গেছে। ভারত ও চীন-এ পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যা যে গোলার্ধে বসত করে, কাঁচামাল পর্যাপ্ত, শ্রম সুলভ, সস্তা সেখানে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। দরকার শুধু টেকনলজি ট্রানস্‌ফার। শিল্পায়ন এখানে হবে আপন গতিতে — যেমন নদী আপন বেগে পাগল পারা; কোনও ভগীরথের প্রয়োজন নেই। শিল্পের জন্য জমি, নগরায়ণের স্থান রাষ্ট্রের হাতেই সংরক্ষিত ছিল। কাজেই সেই সব প্রদেশ টাটা-কে ডাকছে, পাস্কো-কে ঠাঁই দিচ্ছে। ১৯১১ সালে আমেরিকা ছিল ডেভোলাপিং কান্ট্রি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাষ্ট্রস্বার্থে অংশ নেয়নি। ফ্রাঙ্কলিন কজভেল্ট সকল দলমত কে নিয়ে তৈরী করে ছিলেন চারলেন হাইওয়ে। সেদিন থেকেই আমেরিকার যাত্রা হোল শুরু। একাজ অটল বিহারীও আরম্ভ করেছিলেন। তাই একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও পশ্চি মবঙ্গে চুরি ডাকাতির সংখ্যা বাড়েনি। NHAI-তে শ্রমিকরা কাজ পেয়েছিল। সাইকেলে পণ্য চাপিয়ে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক ধরে চাষী শহরে বিক্রী করার সুযোগ পেয়েছিল। ফলে দালালকে ৮ টাকার আলু ৮০ পয়সায় বেচতে হয়নি। সাধারণ মানুষের হাতে পয়সা এসেছে, মোবাইল ফোন এল, সি ডি গ্রামের মানুষের কাছে অপরিচিত নয়। এই উন্নয়নের পুরোহিত দেশের সরকার। ভারত বা পশ্চি মবঙ্গ সরকার। বামফ্রন্ট ও পার্টি নিয়ন্ত্রিত সরকার বলাটা সত্যের অপলাপ মাত্র। নিজের কোলে রাজনৈতিক ঝোল টানার জঘন্য অপপ্রয়াস। এ ভুল পণ্ডিত নেহরু কোনওদিন করেননি। কাজের বিবৃতি দেবার সময় বলতেন, 'হামারা ভারত সরকার'। সরকার কোনও দলের হয় না, সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে দল পরিচালিত হতে পারে। সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে উন্নয়ন দেবতার পুজো হয়। Party in Power উন্নয়নের লাভ নিজের একাউন্টে জমাবে আর Opposition বসে বসে সব দেখবে — এটা অনায্য। যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে টানিবে যে নীচে / পাশ্চাতে ফেলিছ যারে সে তোমারে টানিছে পশ্চাতে — এই গুরুবাক্য অবহেলা করা হয়েছে। 'আমরা ওরা' এই ধরণের বাচালতা, ২৩৫ বনাম ৩০ এর ঔদ্ধত্য অনেকের কানেই বেসুরো লেগেছে। তাই 'চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা' শতবার গাইলেও কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। হবেই বা কি করে 'নিরূপমা' তো আরও এককাঠি সরেশ। কোনও একসময় গলায় কালো স্কার্ফ জড়িয়ে আত্মহত্যা করার নাটক করেছিলেন। এখন টাটাকে তাড়িয়ে বঙ্গভূমে লঙ্কা কাণ্ড করতে চলেছেন। হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই নতুন সন্ধিশব্দ আসবে — বংগ ইডিয়ট - বঙ্ডিয়ট। শুধু টাকার মূল্যে ক্ষতিপূরণ করে দিলেই হয় না, মানুষের সেন্টিমেন্টকেও ছুঁতে হয়। একাজ খুব সার্থকভাবে করেছেন একজন, আট কোটি মানুষের অস্মিতা বোধকে স্পর্শ করেছেন। তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

হাঁই হাঁই করে উঠলো একজন দাপুটে কমরেড। বার বার ওইসব সাম্প্রদায়িক লোকেদের নাম নাও ক্যানো দাদা....রামো রামো ... তাহলে আসলে জিনিসটা দাঁড়ালোটা কি? বৃহৎ স্বার্থে আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দেবো।

অন্য এক খাটো কমরেড বল্লো, — বিসর্জন দেবার কথা উঠছে কোথা থেকে। বামফ্রন্ট সরকার একর পেছু দশ লক্ষ টাকা দিচ্ছে। বাপের জন্মে এ ব্যাটারা এত টাকা এক সঙ্গে দেখেছে — আবার ফালতু কথা — বড়ো কমরেড খেঁকিয়ে উঠলো, — এই তোদের মতো ৭৮ ব্রাণ্ডের কমরেডদের জন্য আজ পার্টির এই দশা, ঠিক মতো কথা বলতে শিখলি না।

আবেদন

গত এক বছরে নিউজ প্রিন্টের দাম বেড়েছে ৪৫-৫০ শতাংশ। তার সাথে মুদ্রণ সামগ্রীর দাম বেড়েছে পাল্লা দিয়ে চড়া হারে। এছাড়া পরিবহণ, বিজলী ইত্যাদির জন্য খরচ বেড়েই চলেছে। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন কয়েকটি সংবাদপত্র ইতিমধ্যেই দাম বাড়িয়েছে।

এই তীব্র-প্রতিকুল পরিস্থিতিতেও স্বস্তিকা গত ৭ জুলাই ২০০৮ তারিখের সংখ্যা থেকে রঙিন (প্রথম ও ষোড়শ) পৃষ্ঠা সহ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। অন্যান্য পত্রিকাগুলি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কিছুটা বাড়তি আয়ের সংস্থান করতে পারলেও স্বস্তিকার পক্ষে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে যে কোনও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও স্বস্তিকার মূল্য একই আছে।

স্বস্তিকার সম্পদ তথা ভরসা তার সচেতন এবং গুণগ্রাহী পাঠকগণ। একজন সংবেদনশীল জাতীয়তাবাদী নাগরিক হিসাবে আপনার কাছে স্বস্তিকার প্রত্যাশা — আপনি নিজে যেমন স্বস্তিকার নিয়মিত গ্রাহক তেমনি আপনার পরিজন এবং সম্পর্কিত জনদের স্বস্তিকার বিষয়ে ওয়াকিবহাল ও আগ্রহী করে তুলুন যাতে তাঁরা স্বস্তিকার গ্রাহক হতে উৎসাহী হন। এর ফলে স্বস্তিকার প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই বর্দ্ধিত সংখ্যার কারণে স্বস্তিকার প্রকাশ ও প্রচারের আংশিক ব্যয় লাঘব করা সম্ভব হবে।

এছাড়া স্বস্তিকার প্রচার সংখ্যা বাড়ায় সরাসরি লাভ হবে জাতীয়তাবাদের প্রচার তথা হিন্দুত্বের প্রচার-প্রসারে। এটা যুগের আহ্বান। আজ শুধু দেশে নয়, সমগ্র বিশ্বে ব্যক্তি ও সমষ্ঠির মধ্যে যে উত্তেজনা, উন্মাদনা, পারস্পরিক দ্বেষ, হিংসা, যাবতীয় সাম্প্রদায়িক হানাহানি চলছে, তার নিরসনে হিন্দুত্বের প্রসার-প্রচার একান্ত কাম্য, একান্ত প্রয়োজন।

গত ৬০ বছর ধরে হিন্দুত্ব প্রচারে ব্রতী স্বস্তিকা। তাই জাতীয়তাবাদী হিন্দুত্বপ্রেমী মানুষ হিসাবে স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়ে আগামী দিনের রাষ্ট্রহিতবাদীদের সংগঠিত করা দরকার যাতে প্রকৃত দেশ স্বার্থ রক্ষাকারীরাই দেশের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারেন। আপনার সক্রিয় সহযোগিতার প্রত্যাশী। শুভেচ্ছা ও নমস্কারান্তে —

— সম্পাদক, স্বস্তিকা

শৈশবকে খুন করছে ভোগবাদী রিয়ালিটি শো

।। দুর্গাপদ ঘোষ।।

সঙ্গীত মানুষের মনকে ছুঁয়ে যায়, মানসিক অবসাদ দূর করে প্রশান্তিতে ভরিয়ে তোলে। সঙ্গীত হল গীত-বাদ্য-নৃত্যের সমাহার। তার অবস্থান প্রায় সর্বত্র। মৌমাছির ডানার কম্পন থেকে সমুদ্রতলে মাছের পাখনার কম্পনেও সৃষ্ট হয় সুর। তাল-লয় থাকুক না থাকুক সুরের মুর্ছনায় মানুষের মতো বিভোর হয় তাবৎ প্রাণীকুলও। বীনের সুরে মাথা দোলায় ভয়ঙ্কর বিষধররা পর্যন্ত। বিভ্রান্ত-উদ্ভ্রান্তদের জন্য মনোবিজ্ঞানীদের পরামর্শ, গান শুনুন। কিন্তু কালের প্রবাহে নামের মোহে, ফ্যাশনের দাপটে গান এখন শোনার চাইতেও বেশি হয়ে উঠেছে যেন দেখা-তে। ইদানীং ভারতবর্ষের সর্বত্র টি ভি চ্যানেলগুলো বাজার মাতাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সঙ্গীত-নৃত্য প্রতিযোগিতার আসর বসাতে। আর তার বাহারি শিরোনাম দেওয়া হয়েছে — 'রিয়ালিটি শো'। 'শো' অর্থাৎ প্রদর্শনী। সঙ্গীতের ৬৪ কলার রিয়ালিটি বা বাস্তবতার সঙ্গে এসবের কতটুকু মিল আছে তা নিয়ে ধন্ধে পড়েছেন বিশিষ্ট সব সঙ্গীতজ্ঞরাই। এই জগঝম্প মার্কা 'রিয়ালিটি শো'-এর দাপটে মানসিক অবসাদ দূর হওয়ার বদলে উল্টে শুরু হয়েছে মানসিক যন্ত্রণা। ছেলেমেয়ে, কচিকাচা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ — এর থেকে রেহাই পাচ্ছে না কেউ-ই। বহু ছেলেমেয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। একাকীত্বের যন্ত্রণায় ভুগছে, মানসিক অবসাদের চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেকে এমনকী স্নায়ুরোগের, মনোরোগের শিকার হয়ে পড়ছে। সেটা কেবল ভারতেই নয়, এমনকী সেইসব পাশ্চাত্যেও যেখান থেকে এই 'রিয়ালিটি কালচার' এদেশে আমদানি হয়েছে।

এক সময় বৃটেনের 'বিট্‌ল'রা ভারত সহ বহু দেশে কান ফাটানো জগঝম্প-এর শো করত। চার বিট্‌লের মধ্যে প্রয়াত জর্জ হ্যারিসনই একজন যিনি এর কুফল অনুভব করে ভারতীয় হিন্দু আধ্যাত্মিকতার অনুসারী হয়ে শেষ জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পেরেছিলেন। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতই তাঁকে দিয়েছিল মানসিক প্রশান্তির কিছুটা প্রলেপ। শেষ জীবনে এর সাধনায় অনেকটা সময়ই নিমগ্ন থাকতেন তিনি। কিন্তু ওই মেয়েটির কী হল? না, এখনই ভারতীয় কিশোরী সিঞ্জিনীর কথা বলছি না। ১৯৯২ সাল। 'স্টার সার্চ' বা তারকা অন্বেষণ নামের জনপ্রিয় মার্কিন টিভি চ্যানেলে চলছে 'ট্যালেন্ট শো'। প্রতিভার সেই প্রদর্শনীতে সেটে হাজির হয়ে সবার নজর কেড়ে নিল ১১ বছরের ফুটফুটে, অসাধারণ সুন্দরী একটি মেয়ে। তারপর তাকে দেখা যায় ডিজনিল্যাণ্ডের একটা জনপ্রিয় ভ্যারাইটি শো 'দ্য মিকি মাউস ক্লাব'-এ। সেখানে সে নিজেকে বিশ্বের সেরা পপ গায়িকা হিসাবে প্রমাণিত করে। কিন্তু 'সেলিব্রিটি' হবার মোহ, তথাকথিত 'ক্যারিয়ার' তৈরির উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা, খ্যাতির মূল্য তাকে দিতে হয়েছে কিন্তু তার জীবনের সমস্ত সুকুমার প্রবৃত্তির বিনিময়ে। 'বেসিক ইন্‌সটিংক্ট' বা আদিম প্রবৃত্তির জন্যই আজ তাকে লোকে বেশি চেনে। নিজের পরিবার-পরিজনের সঙ্গে বছরের পর বছর না থাকতে পারাটা তাকে চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনে ঠেলে দিয়েছে। পুরোপুরি বেহিসাবী জীবন-যাপনের জন্য ওই 'শো-গার্ল' এখন খ্যাতর সঙ্গে সমানভাবে কুখ্যাতও — ব্রিটনি স্পিয়ার্স।

স্বামী বিবেকানন্দ সাবধান করে দিয়েছিলেন, পাশ্চাত্যের পরাণুকরণ এই দেশ ও জাতিকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেবে। কিন্তু স্বামীজীর সেকথা উপেক্ষা করে এখন এদেশে 'স্টার সার্চ', 'মিকি মাউস ক্লাব'-এর অনুকরণে তৈরি করা হচ্ছে নানা শো'। ই থেকে জি — স্টার থেকে সূর্য হেন কোনও টি ভি চ্যানেল নেই যেখানে এইসব 'রিয়ালিটি শো' গুলো বাচ্চাদের মধ্যে অস্বাভাবিক রকম প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়নো মানসিকতার জন্ম দিচ্ছে না। 'সা রে গা মা পা', 'লিট্‌ল চ্যাম্পস', 'ছোটে উস্তাদ', 'ডান্স বাংলা ডান্স' ইত্যাদি শো-এর হোস্ট হিসাবে থাকা বাচ্ছাদের দেখলেই এটা বোঝা যায়। সবাই ছুটছে খ্যাতি আর টাকার পিছনে। সা রে গা মা পা-র বিশ্বসেরা এক শোয়ে জিতে কলকাতার অনিক ধর নগদ ৫০ লক্ষ টাকা পেয়ে লেখাপড়া শিকেয় উঠেছে। দেশে-বিদেশে মঞ্চে মঞ্চে নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে। আর ক্ষুদেদের এক শোয়ে প্রথম হয়ে অসমের ধুলিয়াজানের 'ছোটে মিঞা' অভিজ্ঞান পেয়ে গেছে ২০ যোগ ১ মোট একুশ লাখ টাকা। এই খ্যাতি এবং অর্থলোভের চূড়ায় পৌঁছনোর জন্য টি ভি'র স্পটলাইটের জোরালো আলোয় শুকিয়ে যেতে বসেছে সুকুমারমতিদের শৈশবের মাধুর্য। এরা আবেগপূর্ণ মানুষ হওয়ার বদলে বদলে যাচ্ছে মানুষরূপী যন্ত্রমানবে বা রোবটে।

তাছাড়া এইসব শো-এর পিছনে চলছে আর এক খেলা। সুগায়িকা শ্রীমতী আশা ভোঁসলে পর্যন্ত প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছেন

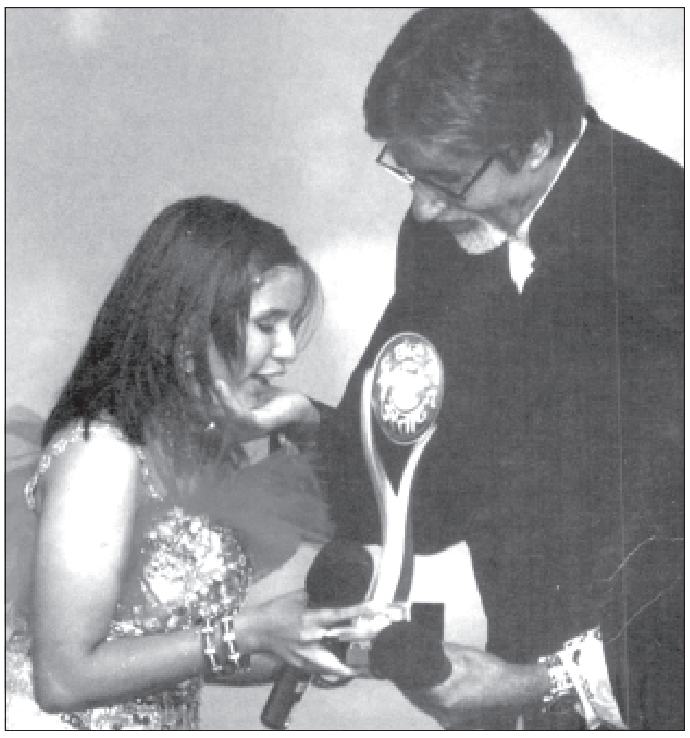

সা-রে-গা-মা-পা'র এক ছোটে উস্তাদ গুজরাটের ঐশ্বর্য অমিতাভ বচ্চনের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছে।

যে তিনি এক প্রতিযোগীকে মান উত্তীর্ণ না হওয়ায় একটি এপিসোডে বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষই অনুরোধ করেন সেই প্রতিযোগীকে সেবার বহাল রাখার জন্য। ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে ফোনে ফোনে, কানে কানে এসব কথা হয়। বাইরের লোকেরা ঠাওর পর্যন্ত করতে পারে না। কেন? কিসের বিনিময়ে সেটা একমাত্র কর্তৃপক্ষই জানেন।

জি টি ভি-র সা রে গা মা পা-র এক শো থেকে প্রথম হয়ে আসা অসমের দেবোজিৎ সাহা অনেকবারই এই জাতীয় শোয়ে অ্যাঙ্কার করছেন। তিনি নিজে আবার 'বিগ বস' বলে একটা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দিচ্ছেন। তিন মাসের ওই শিবির দেবোজিতের নিজের কথাতেই, কার্যত একটা যেন জেলখানা। সেখানে কারও সঙ্গে, এমনকী তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও কোনও সম্পর্ক রাখা যাবে না। আজকের যুগেও থাকবে না কোনও মোবাইল ফোন কিম্বা ইন্টারনেটের ব্যবস্থা। ছোটদের ক্ষেত্রেও তো এই ধরনের শিবিরই হয়ে থাকে। দেবোজিৎ অভিজিৎরা তাদের সবাইকে কতটুকু স্নেহ মমতা দিয়ে ভরিয়ে রাখতে পারেন?

অনেকেরই মতে এই ধরনের অনুষ্ঠানে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের নিয়ে চলছে অনৈতিক ও অমানবিক বাণিজ্য। তরুণী মেয়েদের পোষাক-আসাক যেন দেহ প্রদর্শনীর নামান্তর। শুনতে অরুচিকর হলেও এইসব শোয়ে পোষাক পরিচ্ছদ এবং ঢংঢাং দেখলে মনে হতে পারে — গান তো নয়, যেন সবটাই প্রায় হোটেলের বারে ক্যাবারে নাচাগানা। যে বয়সে শিশুদের প্রকৃতির কোলে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠার কথা সেই বয়েসটাকে তারা যেন বন্ধক রাখতে বাধ্য হচ্ছে, কৃত্রিমতায় ভরা এক রঙিন আশানাইয়ের পরিবেশে। তিলে তিলে তাদের মানসিকতাকে যেন খুন করা হচ্ছে। কবে, কখন, কোথায় একজন শ্রেয়া ঘোষাল উঠে আসবে তার জন্য এই যে সব শো — এটা নিতান্ত বিজ্ঞাপন কেন্দ্রিক বাণিজ্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

এরপর বিচারকদের কটাক্ষ, বকুনি ইত্যাদিও ক্ষতির কারণ হচ্ছে। বিচারকদের অনেককেই দেখা যায় তারা নিজেরাই অনেক জনপ্রিয় গান ঠিক ঠিক , নির্ভুলভাবে গাইতে পারেন না। অথচ তাদের বকুনির চোটে স্নায়ুবিক দুর্বলতার শিকার হচ্ছে নৃত্য

(এরপর ১৫ পাতায়)

শব্দরূপ - ৪৮১

দেবলীনা চ্যাটার্জী

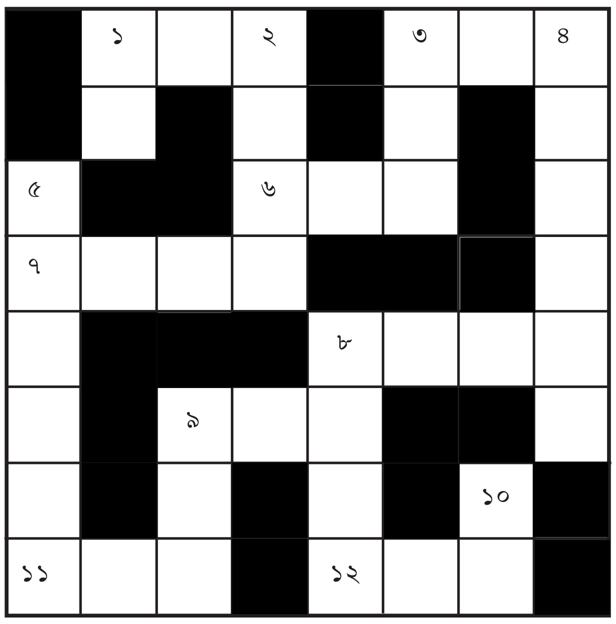

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. প্রতিশব্দে কাতরোক্তি, অনুনয়, ৩. করাত দ্বারা কাঠ চেরা যার পেশা, শেষ দুয়ে নিশি, ৬. কুঁড়েঘর, ৭. অবন্ধুর, এবড়ো-খেবড়ো নয় এমন, ৮. ক্রিয়া বিশেষণে অতি শীঘ্র, ব্যস্ততার সঙ্গে, ৯. বায়ুর অধিদেবতা, শেষ দুয়ে অরণ্য, ১১. একজাতের হরিণ, আগাগোড়া দুধের আস্তরণ ১২. অজয় — ক্রিকেটের এক ব্যাটসম্যান, প্রথম দুয়ে রাত্রি।

উপর-নীচ ঃ ১. অন্য নামে শ্রীকৃষ্ণ, ২. এক কথায় পিতৃবংশ, মাতৃবংশ ও শ্বশুরবংশ, ৩. আরবি শব্দে দোষ, ত্রুটি, আগাগোড়া হাত, ৪. দেশি শব্দে অত্যন্ত চঞ্চ লতা প্রকাশের ভাব, ৫. ইঙ্গ শব্দে অঙ্গরাগাদি, প্রসাধন সামগ্রী, একে-চারে কোমর, ৮. বীণার ন্যায় এক বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, তম্বুরা, আগাগোড়া নক্ষত্র, ৯. ব্যবসায় খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ১০. দশমহাবিদ্যার অন্যতমা, রামায়ণে বালীর স্ত্রী।

সমাধান শব্দরূপ ৪৭৯

ম	■	■	স	ত্য	ব	দ্ধ	■
ঘ	■	■	ক	■	র	■	■
বা	ন	চা	ল	■	ফ	র	সা
■	য়	■	■	■	■	ম	■
■	জ্ঞা	■	■	■	■	র	■
র	ন	পা	■	তি	ল	মা	ত্র
■	■	ল	■	ড়ি	■	■	স
■	পি	ং	প	ং	■	■	ণ

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুন্ডু
কলকাতা-৬
দেবলীনা গঙ্গোপাধ্যায়
হাওড়া, চারাবাগান।
বীরেন মাইতি
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সংখ্যায়।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

২৭/১ বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

ঘোষণা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছে যে, লেখাপড়া করিবার জন্য কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক বৃত্তি ট্রাস্টের প(হইতে প্রদান করা হইবে। উপযুক্ত(প্রমাণপত্র ও সুপারিশ সহ আবেদন গৃহীত হইবে। নিম্নলিখিত হারে বৃত্তি প্রদান করা হইবে ঃ—

নবম এবং দশম শ্রেণী বার্ষিক	১০০০ টাকা
একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী বার্ষিক	১৫০০ টাকা
কলেজ ও বি(বিদ্যালয় বার্ষিক	২০০০ টাকা

আবেদনপত্র সম্পাদক, স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট-কে করিতে হইবে।

৯.১১.০৭

সম্পাদক
স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

বিহারের বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসুন ঃ শ্রী সুদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভারত-নেপাল সীমান্তে প্রবাহিত কোশী নদীর ওপর নির্মিত বাঁধ গত ১৮ই আগস্ট হঠাৎ ভেঙ্গে যাওয়াতে এবং কোশী নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করার ফলে বিহারে এক ভয়াল বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পরিণাম স্বরূপ অকল্পনীয় সম্পত্তিহানি ও জীবনহানি হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিহারের এই বিপর্যয়কে রাষ্ট্রীয় বিপদ বলে ঘোষণা করেছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা অসম্ভব। সমগ্র দেশের সঙ্গে সঙ্ঘও এই ভীষণ পরিস্থিতিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং প্রতিবারের মতো এবারও বিহারের বন্যাকবলিত অঞ্চলে ত্রাণকার্য শুরু করেছে।

বিহারের মাধেপুরা, সহরসা, সুপৌল, অররিয়া এবং পূর্ণিয়া — এই পাঁচ জেলাতে বিপদের খবর পাওয়া মাত্র সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা বন্যার্ত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। সঙ্ঘ পরিচালিত সাতটি কেন্দ্র ও ২১টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ত্রাণকার্য চলছে। শুকনো খাবার বিতরণ, বন্যার্ত মানুষের আশ্রয়শিবির ও বিভিন্ন চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করা হচ্ছে। তাৎক্ষণিক সাহায্য ছাড়াও শত শত গ্রামের অনাথ শিশু, নিরাশ্রিত মহিলা এবং হাজার হাজার পীড়িত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য সঙ্ঘ ব্যাপক পরিকল্পনা করেছে।

এই শিবিরগুলিতে এই মুহূর্তে চার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। এছাড়াও প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। বিহারের এই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দেশের জনগণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে যে, দেশের এই সঙ্কটে অর্থ ও সমস্ত প্রকারের সাহায্য দিয়ে বন্যার্তদের জীবন রক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থায় এগিয়ে আসুন।

ত্রাণকার্যের জন্য চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, আলু, ছোলা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, গুঁড়ো দুধ, প্লাস্টিক শীট, টিন, ওষুধ, জামাকাপড়, শতরঞ্জি, মাদুর ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন। এইসব সামগ্রী সরাসরি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে —

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কার্যালয়
'বিজয় নিকেতন', ৬-ই রাজেন্দ্র নগর, পাটনা-৮০০০১৬, ফোন : ০৬১২-২৬৭৩২০০, ০৯৪৩১০১২৭৪২

পশ্চিমবঙ্গে এই ত্রাণ Bastuhara Sahayata Samiti-র নামে সংগৃহীত হচ্ছে। সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা—

'কেশব ভবন', ৯-এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা-৬, ফোন ঃ (০৩৩) ২৩৫০৮০৭৫, ২৩৫২৭৯৪৬; এই দান ৮০-জি ধারার অন্তর্গত আয়করমুক্ত।

আশ্রয়ের সন্ধানে বিহারে বন্যাপীড়িত অসহায় মানুষ।

রিয়ালিটি শো শৈশবকে খুন করছে

(১৪ পাতার পর)

প্রতিযোগীনী সিঞ্জিনীর মতো অনেকে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল আপন সন্তানদের শৈশব খুন হতে দেখেও, তাদের বাণিজ্যিক পণ্য করা হচ্ছে দেখেও অনেক অভিভাবক চুপ করে থাকছেন। কাউকে কাউকে তো ওইসব শো-তেদর্শাকাসনে বসে রীতিমতো কোমর দুলিয়ে নাচতে গাইত্তেও দেখা যাচ্ছে। এতে নাকি ছেলেমেয়েদের 'ক্যারিয়ার' তৈরি হবে। 'ক্যারিয়ার' — সে তো সেই টাকা এবং খ্যাতি! কিন্তু এর ফলে কতজন ব্রিটনি স্পিয়ার্স, ম্যাডোনা তৈরি হবে সে হিসাবে মাথা ঘামান না বেশিরভাগ অভিভাবক।

প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্করকে একবার এই প্রতিবেদক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এইসব শিশুদের ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সঙ্গীত সাধনার বিষয়, প্রদর্শনীর (শো) বিষয় নয়। এখন অনেক বাবা-মাই তাদের ছেলেমেয়েরা একটু হাত-পা নাড়তে শিখলে, কি গলা খুলতে শিখলেই তাকে টি ভি'র পর্দায় দেখতে চান। এইসব অভিভাবকরাই তাদের সন্তানদের সাধনার পথ থেকে 'শো'-এর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। তাতে করে ওরা আসলটা থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এতে তো ওদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যেতে পারে।

বহু পরিচিত 'আর্ট অব লিভিং'-এর গুরু শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর সম্প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, 'বস্তুবাদের (ভোগবাদের) আত্মতুষ্টি কখনও ওদের সুখী করবে না'।

তাই বলা যায়, অনেক হয়েছে। 'আমেরিকান আইডল'-এর অনুকরণে 'ইণ্ডিয়ান আইডল' জাতীয় এই সমস্ত ভোগবাদী শো অতঃপর বন্ধ হওয়া দরকার। সুস্থ ভারতীয় জাতি গঠনের জন্যই দরকার এটা।

স্বস্তিকা পুজো সংখ্যা ঃ ১৪১৫

সৃজনশীল রচনায় পরিপূর্ণ
এক অসামান্য পরম্পরার পুষ্পাঞ্জলি

উপন্যাস

তনয়া
সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত

এই আখ্যানের নায়িকা রিয়া। যাকে বিলাসপুর থেকে নিছক চাকরির খোঁজে আসতে হয়েছে কলকাতায়। কিন্তু প্রতিদিন এই মহানগরীর কাছে অপমানিত হচ্ছে সে। তাই আজ রিয়া চলে যাবে, কিন্তু এবার শান্তির সন্ধানে। কিন্তু কি ঘটনা ঘটেছিল রিয়ার জীবনে?

মুক্তিপণ
শেখর বসু

'আপনার কী মনে হয় কৌশিকদা, রনিকে কি সত্যি সত্যি অপহরণ করা হয়েছে? হতে পারে। নাকি ও নিজেই ওই অপহরণের গল্পটা চালু করেছে দাদুর কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করার জন্যে? গোয়েন্দার ঠোঁটে রহস্যময় একচিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল, তদন্ত ভালভাবে শুরু করার আগে পর্যন্ত সব সম্ভাবনার দরজাই তো খোলা থাকে।'

এই সময়
কণাবসু মিশ্র

'নিজেকে খুব উঁচু মাপের মানুষ করে রেখেছে সৈকত। আর সীমান্তিনী ক্রমেই ওর কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছে। তবুও সৈকতের জন্যই ছুটছে সে। কান্নার পুরু সর জমতে জমতে ওর বুকের মধ্যটা যেন গ্র্যানাইট পাথর হয়ে গেছে।'— এর সমাধান কোথায়? স্বামী মুক্তানন্দজীর মার্গদর্শন কী সীমান্তিনীকে পথ দেখাতে পারবে? দুই সন্তানের জননী যাজ্ঞসেনীরই বা কী হবে?

স্বপ্নভঙ্গের এক করুণ কাহিনী
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

এই দিল্লী আজকের নয়। মুঘল-পাঠানদের আমলের। এই দিল্লীর রাস্তার মোড়ে সামান্য গোলদারি দোকানের মালিক হেমকান্তি ভাগ্যের ফেরে সুলতানী সাম্রাজ্যের উজির হয়েছে। এখান থেকেই তার স্বপ্ন দেখা শুরু। স্বপ্ন দেখছে হিন্দু সম্রাট হওয়ার। তার স্বপ্ন কি বাস্তবে রূপায়িত হবে? নাকি স্বপ্নকে বাস্তবের রূপ দিতে গিয়ে সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে?

প্রবন্ধ

১৯০৮ সালের বোমার গল্প ঃ শতবর্ষের আলোকে বাংলার বিপ্লবের সূচনা — রবিরঞ্জন সেন। ভ্রান্ত পথিক ডিরোজিও — প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়। জড়বিজ্ঞানীদের পক্ষে আত্মার রহস্য উন্মোচন করা এক অসম্ভব কাজ — ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী। মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ ফজলুর হক থেকে বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য — ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ। অগ্নিপুরাণে ভারতীয় মনীষা — ডঃ রবীন্দ্রনাথ বসাক। স্বরাজের দাবিতে ইংলণ্ডে প্রথম সভা — গুরুপদ শাণ্ডিল্য। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদ — সুবীর ভৌমিক। চতুর্থ পরিসর ও গণতন্ত্রে বিকৃতি — তথাগত রায়। মহাভারত কি ব্যাসদেবের আত্মজীবনী?— মানিক চন্দ্র দাস। আয়ুর্বেদের পুনরুত্থান ঃ ভারতের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা — দেবীপ্রসাদ রায়। শিবাজী ও শাহজাদী — প্রসিত রায়চৌধুরী। হিন্দুত্ব প্রসঙ্গে — প্রীতিমাধব রায়। বিপ্লবী বীর সাভারকর আজ উপেক্ষিত কেন — নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য। ভারত এক সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র — কে এস সুদর্শন।

গল্প

রফা — সজল দাশগুপ্ত
নিষ্ক্রমণ — মানবেন্দ্র পাল
বিনোদ ঠাকুরের গল্প — গোপালকৃষ্ণ রায়
ফরেনার — এষা দে
মনের আয়নায় নিজেকে দেখি — সুমিত্রা ঘোষ
সংসার সুখের হয় — রমানাথ রায়
বেঁচে থাকার অন্যমুখ — দীপঙ্কর দাস
কিডন্যাপ — বাদল ঘোষ

দেবীবন্দনা

শক্তি ছাড়া কী মা মহাশক্তির পূজা হয়? — স্বামী যুক্তানন্দ

রম্যরচনা

হুকো বার ঃ এক যৌন সুড়সুড়ির ব্যবসা — চণ্ডী লাহিড়ী

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হচ্ছে ◆ দাম চল্লিশ টাকা মাত্র

Swastika
15 September - 2008, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

মুক্ত আকাশে ভোকাট্টা

সতীনাথ রায়।। নীলুবাবু ছাদের ওপর চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ কাগজটা বন্ধ করে দিলেন। চা'র কাপটা নামিয়ে ঘর থেকে একটা ক্যালেণ্ডার নিয়ে এলেন। সেটাকে কিছুক্ষণ দেখার পর আর্কিমিডিস-এর সেই 'ইউরেকা' বলার ঢঙে 'হ্যাঁ পেয়ে গেছি' — বলে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন। দশ বছরের পল্টু বাবার হঠাৎ এমন চিৎকার শুনে ছুটে এল। বাবা, কী হয়েছে? নীলবাবু উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আর কী হবে। বিশ্বকর্মা পুজো তো এসে গেল রে। সামনের ১৫ তারিখেই। চ-চ, এবার সব কেনা কাটি সেরে ফেলতে হবে। গত বছর আমরা জিতেছি, এবারও দেখবি আমরাই জিতব। বিশ্বকর্মা পুজোকে ঘিরে নীলুবাবুদের আনন্দটা বছরের অন্যান্য পুজো-পার্বনের থেকে যেন একটু বেশিই। বছরের এই একটা দিনে সবাই মিলে ছাদে ঘুড়ি নিয়ে যেন সংসার পাতা হয়। বাম-ডান-উত্তর-দক্ষিণ সবদিকের সব ছাদেই এই একই চিত্র। ঘুড়ির সঙ্গে শৈশব কাঠানোর দৃশ্যগুলো এখনও নীলুবাবুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দুপুর বেলায় মা ঠাকুরমার নজর এড়িয়ে মাঠে গিয়ে সবার সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দটাই অন্যরকম। কে কত বেশি ওপরে ঘুড়ি তুলতে পারে সেটাই যেন মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ঘুড়ির সুতোর সঙ্গে দৌড়াতে দৌড়াতে কত বিপজ্জনক রাস্তার ওপরই না হাঁটতে হয়েছে। তবুও সে সবের আনন্দটাই আলাদা। সেই সব কথা মনে পড়লে গা যেন শিউরে ওঠে। গাঁয়ের সবুজ ময়দানের ঘুড়ি ওড়ানোর সেই আনন্দ এই শহরে ছাদের ওপর কখনও পাওয়া যায় না। তবুও সকলের সঙ্গে একটা দিন ঘুড়িকে নিয়ে কাটাবার আনন্দটাও তো কম নয়। নগরায়ণের চাপে গ্রাম-বাংলাতেও সেই দৃশ্য ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। আসলে ঘুড়ি ছাড়া বিশ্বকর্মার পুজোর মূল আকর্ষণটা যেন অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়ে।

হুঁ, অত সহজে কী আর ঘুড়ি আকাশে ওড়ে? তার জন্যও কম বড় আয়োজন করতে হয় না। দামি সুতো কেনা, বড় লাটাইটা আগে ভাগে যোগাড় করা — এসব কী আর মুখের কথা। এর ওপর আছে সুতোতে মাঞ্জা দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রায় হাফ বেলা ধরে এই কাজটা করতে হয়। আসল টেকনিসিয়ানের পরিচয়টা তো এখানেই। কাজটা যেমন শক্ত তেমন প্রয়োজন ধৈর্যরও। ঘুড়ির লড়াইয়ে জেতার এটাই প্রধান হাতিয়ার। প্রায় নুনের মতো কাচ গুড়োকে মিহি করতে হয়। সেই কাঁচগুড়োকে আঠার সঙ্গে মিশিয়ে গরম করতে হয়। আঠারও আবার বিভিন্ন রকমারি আছে। কেউ কাকের ডিম মেশায়। কারও কারও পছন্দ ভাতের মার। অ্যারারুট তো আছেই। বর্তমান বাজারে অবশ্য রেডিমেট আঠার দৌলতে এসব ঝামেলা নেই। অনেকটা লুচির লাই-র মতো শক্ত করে সেটা ভালোভাবে সুতোর গায়ে সুক্ষ্মভাবে ঘষতে হয়। কোনও অংশে কম বা একটু বেশি হলে সুতো টানার সময় হাত কেটে যাওয়ার সম্ভবনাও থাকে। তবে একটা লাটাই-এ যত সুতো থাকে তার ৮০ শতাংশ সুতোতেই শুধুমাত্র মাঞ্জা দেওয়া হয়।

বাবা ঘুড়ি কারা প্রথম উড়িয়েছিল — পল্টুর প্রশ্নে নীলুবাবুর যেন চমক ভাঙলো।

সে অনেক কথা — বলে ছেলের প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেই পারতেন, তবে আজ রবিবার, হাতে কিছুটা সময়ও আছে। তাই বলতে শুরু করলেন — ঘুড়ির প্রথম আবিষ্কার নাকি চীন দেশে বলে অনেকের ধারণা। প্রচলিত কিংবদন্তী হল — খৃস্টের জন্মেরও দুশো বছর আগে চীনা সেনাপতি হান সিন যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ঘুড়িকে এক অভিনব পদ্ধতিতে ব্যবহার করেছিলেন। পটকার মতো বোমা ঘুড়ির সঙ্গে লাগিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে নিক্ষেপ করতেন। এর ফলে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল শত্রুপক্ষের শিবির। সেই যুদ্ধে তিনিই জয়ী হন। চীনদেশে ঘুড়ির সেই থেকেই প্রচলন বলে অনেক চীনা উপাখ্যানে লেখা আছে। আবার জাপানে হিয়ানের সময়ে প্রথম আকাশে ঘুড়ি উঠতে দেখা গিয়েছিল। বাঙলায় ঘুড়ির ইতিহাসটাও কম মজার নয়। শোনা যায়, লখনউ-এর এক নবাব কলকাতার মেটিয়াবুরুজে আসার সময় একটি ঘুড়ি সঙ্গে এনেছিলেন। ঘুড়ির ইতিহাস নিয়ে নানা কথা প্রচলিত থাকলেও দেশ কাল নির্বিশেষে ঘুড়ি মানুষের কাছে খুব সহজেই আকর্ষণীয় খেলায় পরিণত হয়েছে। মানুষের মনে অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে।

জাপানে ঘুড়ির দিন হিসাবে ৫ মে খুবই স্মরণীয়। ৫ মে শিশু দিবসের এই দিনে প্রতিটি বাড়ির দরজার সামনে বাঁশের ডগায় বাচ্চাদের জন্য ঘুড়ি টাঙানো হয়। জাপানি নববর্ষ দিনটা হল ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব। ভারতে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং বাঙলায় ঘুড়ি ওড়ানোর প্রচলন সর্বাপেক্ষা বেশি। গুজরাটের 'উত্তরণ' নামে একটি উৎসবে ঘুড়ি ওড়ানো হয়ে থাকে। লাহৌরে বসন্ত পঞ্চমীর দিন ঘুড়ি ওড়ানোর প্রচলন আছে। পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বকর্মা পুজোর দিনের সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী পুজোতেও ঘুড়ি ওড়ানোর চল রয়েছে। তবে বিশ্বকর্মা পুজোর দিনই বিভিন্ন জায়গাতে ঘুড়ি ওড়ানোর চল বেশি।

ঘুড়িকে প্রাচীনকালে সংবাদ আদান-প্রদানের বাহক হিসাবেও ব্যবহার করা হোত। আবার কখনও যুদ্ধে কিংবা

আবহাওয়ার খবরা-খবর জানতেও ব্যবহার করতে দেখা গেছে। ১৭৪৯-এ স্কটল্যাণ্ডের আলেকজাণ্ডার ভিলসন ও টমাস মেলভিন নামে এই দুই ছাত্র তাদের ঘুড়িটিতে থার্মোমিটার লাগিয়ে তা আকাশে ছেড়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে ঘুড়ি নামিয়ে তারা ভূ-পৃষ্ঠের ওপরের তাপমাত্রা জানতে পারে। বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন মেঘ ও বিদ্যুতের বিভিন্ন খবর আগাম পেতে অদ্ভুতভাবে ঘুড়িকে ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়া ছোটো ক্যামেরা ঘুড়ির গায়ে লাগিয়ে শত্রুপক্ষের খবরা-খবর জেনে নেওয়ার ঘটনাও শুনতে পাওয়া যায়। জানা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঘুড়ির মাধ্যমে রেডিয়ো অ্যান্টেনা বা এরিয়াল শূন্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মালয়েশিয়ার জাভাতে এক সময় ঘুড়ি পাওয়া যেত যাতে কোনওরকম লেজ থাকত না। ১৮৯০-তে এডি (Eddy) ডায়মন্ড আকারে ঘুড়ি তৈরি করেছিলেন — এতে কোনও লেজ ছিল না। তিনি ওই ঘুড়ির সাহায্যে আবহাওয়া ও তাপমাত্রার খবর সংগ্রহ করতে সফল হয়েছিলেন। তাঁর সেই ঘুড়ি 'Eddy kite' নামে পরিচিত। কিন্তু সে দিক থেকে এই কাজে বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কলিন বেশি সফল হয়েছিলেন।

নীলুবাবু ছেলে যা জানতে চেয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশিই বলতে লাগলেন। আসলে ঘুড়ির ব্যাপারটা। তাঁর এমন ভাবে মজ্জায় ঢুকে গেছে যে ঘুড়ির কথা উঠলেই তিনি আর থামতে পারেন না। ঘুড়ির পরম্পরার দিকটাও তাই ছেলেকে বলতে লাগলেন — নিউজিল্যাণ্ডবাসীদের মধ্যে সংস্কারের প্রতীক হিসাবে ঘুড়িকে বেশি ব্যবহার করতে দেখা গেছে। তারা ভুত-প্রেত বিতাড়নে ঘুড়িকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করত। তবে একে অনেকে কুসংস্কার বলে সেই সময় অবজ্ঞা করলেও সেই সংখ্যাটা কিন্তু বিশ্বাসীদের তুলনায় খুব কম ছিল। নিউজিল্যাণ্ডের বাসিন্দারা ভুত প্রেতের হাত থেকে মুক্তি পেতে এক ধরনের ঘুড়ি উড়াত। যাতে অসংখ্য ছোটো ছোটো ছিদ্র থাকত। ধাতব চাকতি বসানো হতো ওই সব ছিদ্রের ওপর। এর ফলে বাতাস দিলে স্বাভাবিক নিয়মেই বাঁশির মতো শব্দ হত। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস ছিল ওই আওয়াজে নাকি ভূত-প্রেতরা কাছে আসার সাহস দেখাত না। মালয়েশিয়ার অধিবাসীদের ধারণা — ঘুড়ি উড়ালে নাকি মানুষের দুঃসময় ও দুঃখযন্ত্রণা ঘুড়ির সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়ে যায়। ফলে সৌভাগ্য লাভ হয়।

কিংবদন্তী, শ্রুতিকথা, ইতিহাস — এই সব ছাড়িয়ে ঘুড়িতে এসেছে নানানবৈচিত্র্য। জাপান, চীন, ইন্দোচীনের মতো আমাদের দেশের ঘুড়িতে অতটা বৈচিত্র্য না এলেও ঘুড়িকে বিভিন্ন প্রাণীর আকৃতিতে তৈরি করার উদাহরণ যে একেবারেই নজরে আসে না তা নয়। এখন আবার ঘুড়িতে বিভিন্ন প্রডাক্টের বিজ্ঞাপনও দেখা যাচ্ছে।

ঘুড়ি খেলা হিসাবে পরিচিত হলেও আকাশে ওড়ার এই অদ্ভুৎ কাগজের খেলনাটিই বিশ্বকর্মা পুজোকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। এদিন সকাল থেকেই পাড়ার কচিকাচারা কাঁসর ঘন্টা আর ভোকাট্টার ধ্বনি দিয়ে পুরো পরিবেশ-টাকে উৎসব মুখর করে তোলে। একটা সময় ছিল যখন কলকাতার বাবুরা ঘুড়িতে নোট ঝুলিয়ে আকাশে উড়াতো। ট্রাম লাইনের ফাঁকে বোতল গুজে দিয়ে মাঞ্জা দেওয়ার জন্য কাঁচ গুড়ো করত। সেদৃশ্য আজ অনেকটাই অমিল। তবে সবটা হারিয়ে যায়নি। 'ভোকাট্টা' আজও শোনা যায়। হৃদয়ের আনন্দময় অনুভূতিগুলি যেন ঘুড়ির হাত ধরে আবার ফিরে আসে। যান্ত্রিকতার জীবন থেকে ভোকাট্টা যেন সামান্য সময়ের জন্য হলেও মুক্তি দেয়। আজ বিশ্বায়ণের যুগে **Email, Sms** ভোকাট্টার জায়গা দখল করেছে। **'HAPPY BHOKATTYA'** লিখেই আমরা দায়িত্ব পালন করছি। চার দেওয়ালের বাইরের মুক্ত আকাশটার কথা যেন ভুলেই গেছি। মুক্ত আকাশ যেন **Computer**-এর **Screen Saver**-এ পরিণত হয়েছে।

নীলুবাবুকে এবারে বাজারে যেতে হবে। তাই ছেলেকে বললেন, এসব অনেক কথা রে। আজ থাক। থাক বললেন বটে, কিন্তু মনের কোণে স্মৃতির বীণার তারে অনুরণনটা রয়েই গেল — আসুন না, মুক্ত আকাশের নিচে এক হই। সব ঝাঞ্ঝাট কাটিয়ে মহাউল্লাসে বলি — ভোকাট্টা...ট্টা...ট্টা।

বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের গ্রাহক মেয়াদ পূজা-০৮-এর আগে শেষ হচ্ছে, তাঁদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, সত্বর পরবর্তী বছরের গ্রাহকমূল্য ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সহযোগিতা করুন, যাতে আপনার পূজা সংখ্যাটি সময়মতো পাঠানো সম্ভব হয়।

মহালয়ার আগেই পূজা সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com